ক্রিসমাস এসে গেল। ডিসেম্বর ঠাণ্ডার মাস, উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে এখন শৈত্যপ্রবাহ তুঙ্গে, কিন্তু দক্ষিণে বৃষ্টি ও নিম্নচাপ... অপূর্ব বিস্ময়ের দেশ ভারতবর্ষ, যেন সারা বিশ্বের একটি নিখুঁত মডেল। অথচ অবাক লাগে, এই বিশাল দেশের কত মানুষ আজও আঞ্চলিক গণ্ডির বাইরে এসে পুরো দেশটাকে নিজের বলে ভাবতে পারেন না! যেভাবেই হোক, এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে অখণ্ডতার রূপ দিতেই হবে, অনেক দেরি হয়ে গেছে...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৭
ডিসেম্বর ২০২০

অনু সাহিত্য সংখ্যা

কলম হাতে

দেবাশিস চক্রবর্তী, অলক চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অমিত চৌধুরী, নবীন চৌধুরী, অনিমেষ বৈশ্য, বিজয় নারায়ণ চৌধুরী, নন্দিতা চৌধুরী, পিনাকী বিশ্বাস, সন্দীপ বাগ এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা......

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"এখন যুদ্ধ না শান্তি করে বুঝতেই পারি না।"

(এখন শান্তিও যুদ্ধ, **শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**)

শ্রী ৺অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জন্মঃ ০৬ ১০ ১৯৩৩ ☐ মহাপ্রয়াণঃ ১৭ ১১ ২০২০

কিছু মানুষ ইহলোক ত্যাগ করলেও পৃথিবী থেকে তাঁদের স্মৃতি কখনই বিলুপ্ত হয়না। সদ্য প্রয়াত কবি শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁদেরই একজন। অনেক বাঙালি প্রবাসী মানুষ কিছুদিন বিদেশে থেকেই বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, কিন্তু এই কবি মানুষটির চরিত্র ছিল ভিন্ন। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও, বাংলা ও সাঁওতালি সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে তিনি সদাই প্রচেষ্ট ছিলেন। সাথে সাথে বিদেশি সাহিত্যকে বাঙালির কাছে আনার দায়িত্বও তিনি বহন করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধক এই মানুষটি বাঙ্গালি পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন। প্রণাম প্রণাম প্রণাম... ■

বিনীত — প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের স্মৃতির আলয়ে অমর হয়ে রইবেন সকল গুণী শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। চলতি বছরের একেবারে প্রাকলগ্ন থেকে শেষ অবধি শুধু হারানোর বেদনাই বয়ে চলছি আমরা। ভারতের বহু বিশিষ্ট স্রষ্টা এখন সেই সুদূর গগন পরে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাজি হয়ে বিরাজ করছেন। তবে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভারের প্রাচুর্য আগামী প্রজন্মকে করবে অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী।

বছরের শেষদিকে হারিয়ে গেলেন আরেকটি জ্যোতিষ্ক, শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়। যাঁর রচনার বৈচিত্র্য, মনীষা ও সংবেদনশীলতা বাংলা তথা বিদেশি সাহিত্যকে দিয়েছে নব নব সৃষ্টির অমৃত ভাণ্ডার।

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি ও চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। বিশটিরও বেশি কবিতার বই তিনি লিখেছেন। বাংলা আঞ্চলিক ভাষার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ প্রেম। সাঁওতালী ভাষার বহু কবিতা ও নাটক তিনি যেমন ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন, আবার তেমনি জার্মান ও ফরাসি সাহিত্য থেকে বহু লেখা তাঁরই প্রচেষ্টায় অনুদিত হয়েছে বাংলায়।

এমন একজন সুদক্ষ ভাষাবিদের সৃষ্টিকর্ম ফিরে পাব না আর... তিনি যেভাবে ভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে ভাষান্তরের কুশলতায়, আপন শিল্প নৈপুণ্যে, নিজস্ব গদ্যরীতির বর্ণাঢ্যে, শব্দের নবায়নে অঙ্কিত করে রেখে গিয়েছেন — তা চিরতরে পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে যাবে। প্রণাম প্রণাম প্রণাম...■

বিনীতা — রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

স্মৃতির স্মরণে রসরাজ

শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের অঙ্গনে যাঁদের সাথে এক-যোগে কাজ করা হয়, এ কথা সবাই জানেন যে কালক্রমে তাঁরা একান্ত আপন – নিজের পরিবারের সদস্যদের মতই হয়ে ওঠেন। তাই খুব বেশি কাছের মানুষ হঠাৎ চলে গেলে, ঠিক কি হয় – দুঃখ, রাগ না অভিমান – সে কথা ভাষায় প্রকাশ করার মত দক্ষতা আমার নেই। শুধু বলব অসিতদার (শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায়) শূন্যস্থান পূর্ণ করার মত আমার আর কেউ নেই।

 *Background Photo by Galina N on Unsplash
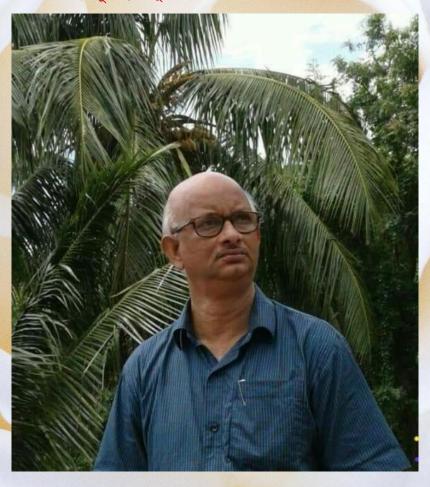
স্মৃতির স্মরণে রসরাজ

আমি যখন মাত্র চোদ্দ বছরের, তখন থেকেই ওনার কাছে যাওয়া শুরু হয়। অসিতদা সাঁতরাগাছি কেদারনাথ বিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের হায়ার-সেকেণ্ডারির স্নাতক, কাজেই আমার সিনিয়র প্রাক্তনী। স্কুলেই প্রথম ওনার সেইসময়ে প্রকাশিত 'শঙ্খ' ক্ষুদ্র-পত্রিকাটি আমার হাতে আসে। তখন সাঁত্রাগাছিতে প্রতি পনেরো দিনে 'পাক্ষিক' নামে একটা সাহিত্যসভার আয়োজন হত। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় ঐ 'পাক্ষিক' থেকেই ওনার সাথে পরিচয়। তারপর আমাদের 'গুঞ্জন' যখন প্রকাশিত হতে শুরু হল (১৯৭৭) তখন ওনার কাছে লেখা আনতে যেতাম। আর সম্প্রতি তো অনেকবারই 'গুঞ্জন'এ লিখলেন।

বড় মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন অসিতদা। সবার সাথে কত সহজে মিশে যেতে পারতেন! নিজে ভাল রস-সাহিত্য লিখতেন, কিন্তু চিরকালই সবাইকে নিয়ে চলতেন, গাইড করতেন। যাদের লেখা কমজোর, তাদেরকে ভাল লেখার কায়দাগুলো শিখিয়ে দিতেন।

রসসাহিত্যের এই মহান স্রষ্টা শুধু গল্প আর নাটক লেখার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নিজে অভিনয় করেছেন, একজন সাংগঠনিক হিসাবেও কাজ করেছেন। 'হাওড়া রসিক সভা' ওনারই 'ড্রীম-চাইল্ড'। তাছাড়াও সাঁতরাগাছি কেদারনাথ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের লেখা নিয়ে, এবছর প্রকাশ করেছিলেন ই-ম্যাগাজিন 'ইস্কুলবেলা'।

জীবনের শেষ লেখাটি প্রিয় অসিতদা উপহার দিয়ে গেলেন 'গুঞ্জন'কে। নভেম্বর সংখ্যার লেখাটি পড়ে রাজশ্রীর মনে হয়েছিল জিজ্ঞাসা করবে, "আপনি নিজেকে নিয়ে এমন লিখলেন কেন?" কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর ও আর পাবে না, আমরা কেউই জানব না... ■

শোকার্ত প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

প্রচ্ছদঃ Photo by snapwire from Pexels

কলম হাতে

পাঠকের দরবার

অক্টোবর ২০২০ সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া

'গুঞ্জন' ই-ম্যাগাজিনটা সেদিন খুলে দেখার অবসর পেলাম। স্বভাবতই 'বায়াসড্' হয়ে পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস আর প্রণব বসুর লেখা আগে পড়লাম আর তার সাথে আরও দু তিনটে কবিতা। কবিদের নাম, পত্রিকাটি বন্ধ করে এসে সেদিন লিখতেই ভুলে গেলাম। বয়স জানান দিল, যতই নিজেকে ভাবি না কেন জোয়ান। তবে অবশেষে পড়া যখন শেষ হল, তখন একটা পাঠ প্রতিক্রিয়া লেখার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল। যাই হোক, এবার আসি 'গুঞ্জন'এর লেখাগুলি সম্পর্কেঃ

প্রচ্ছদটি বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে খুবই মানানসই হয়েছে।

রিত্বিকা চ্যাটার্জির "করোনা কালে এলেন মা দুর্গা" ছবিটাও সুন্দর লাগল।

অর্ঘদীপ সেনগুপ্তের "সংহারমূর্তিতে এলেন মা দুর্গা"– ছবিটিও প্রশংসা যোগ্য।

ডাঃ অমিত চৌধুরীর — 'নমামি দেবী নর্মদে – শিব দুহিতা নর্মদা' একটা সমৃদ্ধময় রচনা।

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাসের ছোট্ট লেখাটি অসাধারণ লাগল, বিরিয়ানির রসুন আর পেঁয়াজ কাটার কাহিনী।

প্রণব কুমার বসুর কৌতুক ছলে বাস্তব বিন্যাস ও দারুণ।

পাঠকের দরবার

তাপস কুমার চক্রবর্তীর 'বিদ্যাসাগর' — অসাধারণ। বাঙালির জ্ঞান ও চেতনাবোধের অধঃপতনের প্রতি ইঙ্গিতটা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

বিজয় নারায়ণ চৌধুরীর প্রতিবেদন 'কোভিড ১৯ ও আমরা' সচেতনতাবোধের মোক্ষম আলোচনা, সমালোচনা, কিংবা পর্যালোচনা।

সামিমা খাতুনের কবিতা 'স্মৃতি ভেজা রাত'এর সুন্দর কাব্যিক উপস্থাপনা ভালো লেগেছে।

সন্দীপ বাগের লেখা 'তফাৎ'ও অসাধারণ।

সব লেখাই চিরাচরিত লেখার থেকে অনেকই স্বতন্ত্র। সকল লেখাগুলি আমার কাছে সামগ্রিকভাবে খুব উচ্চমানের সাহিত্য বলেই বোধ হয়েছে। ■

আপনি কি 'গুঞ্জন' পড়েছেন?

'পাঠকের দরবার' বিভাগটি এবার থেকে নিয়মিত প্রকাশ করা হবে। আমরা এই বিভাগে আপনাদের মতামত প্রকাশ করতে চাই।

অতএব পড়া হলেই আমাদের দপ্তরে আপনার মূল্যবান মতামতটি পাঠিয়ে দিন। সাথে আপনার একটি ছবিও থাকা চাই। আর কোন সংখ্যাটি প্রসঙ্গে বলছেন, সেই মাসের নামটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)
ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পাঠকের দরবার

সাগরিকা চক্রবর্তী
সাহিত্যিকা

অক্টোবর ২০২০ সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া:

গুঞ্জনের গল্পগুলো পড়ে বেশ লাগলো। পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাসের লেখাটি চিরকালের মতোই খুব ভালো, সত্যি বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে হওয়ার কি জ্বালা! ছোট ছোট ঘটনাগুলো এমন মজা করে, সুন্দর করে লেখেন যে অসাধারণ হয়ে ওঠে লেখাগুলো।

শ্রেয়সী পাঁজার 'অনামিকা' লেখাটাও বেশ ভালো।

অনির্বাণ বিশ্বাসের লেখা গল্পে ভুলুবাবুর পুজো করাটাও দারুণ লাগলো।

'কোভিড ১৯ ও আমরা' লেখাটা পড়লাম খুব বাস্তব লেখা। এই বিড়ম্বনার সময় যাঁরা সকলের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সকলকে ভালো রাখতে নিজেদের মানুষগুলোর থেকে দূরে থেকে লড়াই করেছেন আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম তাঁদের।

সামিমা খাতুনের 'স্মৃতি ভেজা রাত' কবিতাটিও খুব সুন্দর।

সন্দীপ বাগ মহাশয়ের 'তফাৎ'টা সত্যি খুব বাস্তব লেখা, বেশ ভালো লাগলো।

'গা-গেরামের গল্পে' দাদু নাতির সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর কথা জেনে, খুব ভালো লাগলো। দাদুর গেরামের গল্পের তো তুলনা নেই, পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আমিও হয়তো ওখানে বসেই শুনছি আর ছবির মতো ভেসে উঠছে সব। খুব সুন্দর লেখা। ■

পাঠকের দরবার

সমীর দাস

লেখক

নভেম্বর ২০২০ সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া:

নভেম্বর এর গুঞ্জন পড়লাম, দুয়েক জনকে পড়ালামও। মনে হল একটা পরিণত পত্রিকা পড়লাম। সব কিছুর সুন্দর সমন্বয়, খুব ভাল লাগল।

রিত্বিকা আর অর্ঘ্যের আঁকা ছবি অসাধারণ।

ধারাবাহিকগুলো আগে পড়িনি বলে পুরো রস আস্বাদন হল না।

সম্পূর্ণ ভূত চতুর্দশি সংখ্যাটাই তো অসাধারণ।

বুঝি প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা, কিন্তু পড়তে বেশ চেষ্টা লাগে। বিশেষত গদ্য অংশ, প্যারাগ্রাফ এর মাঝে একটু ফাঁক থাকলে সুবিধে হত।

আসলে এই অসুবিধা ধীরে ধীরে আমাদের অণু-গল্প বা কবিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আমার 'বাল্য-খিল্য' কবিতাটি প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

পত্রিকা চালিয়ে যান, আমার শুভেচ্ছা সর্বদা। ■

'গুঞ্জন' এর দফতর থেকেঃ

প্রিয় সমীর বাবু,

অমর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য উপলব্ধি করেছিলেন "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়…।" আমরাও তাই দেখছি। কাহিনীর জন্য গদ্য-মাধ্যমই জনপ্রিয়। ভাব আর ভাবনার জন্য পদ্য। 'গুগল'এ টাইপ করুন 'গুঞ্জন বাংলা ই-পত্রিকা', একাধিক জায়গায় পুরানো সংখ্যাগুলো পাবেন, 'পাণ্ডুলিপি'তে তো আছেই। 'অ্যামাজন কিণ্ডিল' এর মত গুঞ্জন 'ট্যাব' বা 'কম্পুটার'এ বেশি ভালভাবে পড়া যায়।■

ঢের আগেকার রূপকথা এখনো বলে কথা

দেবাশিস চক্রবর্তী

অনেকদিন আগে একটা গানের লাইন লেখা হয়েছিলঃ

"যদি কাগজে লেখো নাম, সে নাম ছিঁড়ে যাবে।
যদি হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে।"

অর্থাৎ জীবনে যদি নাম লিখতেই হয়, তবে সে নাম হৃদয়েই হয়তো লেখা ভালো। কিন্তু আদতে মানুষ হলো ভীষণ প্রচার-প্রিয় জীব। ফলে তাকে গভীর ভাবেই হয়তো আত্মপ্রচার করতে হয়। গাছের গায়ে নিজের প্রেয়সী বা প্রেমিকের নাম লিখতে হয়। সুতরাং টাকার শরীরেও এখন মানুষ নিজের মোবাইল নাম্বার লেখে, আর এই লেখার ভেতর দিয়েই হয়তো সে একটা কমিউনিকেশানও গড়ে তুলতে চায়। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি এই চাওয়ার মধ্যে, সেরকম কোনো গভীর অন্যায়ও খুঁজে পাইনা। তবে একটা জিনিস আমার ভীষণ অদ্ভুত লাগে, এই চাহিদার খেলা খেলতে গিয়ে কি, মানুষ ক্রমশ তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে? অর্থাৎ, কাগজের ওপর নাম লেখার খেলা খেলতে গিয়ে কি, আমরা ক্রমশ হৃদয়ের ওপর নাম লেখার

কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি? হৃদয়কে বোঝার জায়গা থেকে, কয়েক আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছি? আধুনিকতার এই সঙ্কটকে বিশিষ্ট লেখক এমবারতো ইকো, দেখাতে গিয়ে আমাদের হয়তো এক অদ্ভুত কৃষ্ণগহ্বরের সামনেই এনে দাঁড় করিয়ে দেন।

তাঁর সাফ কথা – একবিংশ শতকে প্রেম নিহত হয়েছে বলেই হয়তো, তাকে ঘিরে চারিদিকে বেড়ে গিয়েছে হাজার হাজার সেলিব্রেশন। ইকো আমাদের দেখান, চারিদিকে প্রেম যত কমছে ততোই গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা সিনেমায় আমরা সেই হারিয়ে যাওয়া বিষয়টিকে ফিরে পাওয়ারই আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এই পরিস্থিতিটা হয়তো অনেকটাই সেই টাইটানিকের শেষলগ্নের দৃশ্যটির মত — জাহাজটা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে, আর জাহাজে বসে শিল্পীরা বাজিয়ে চলেছে, কোনও এক ব্যথা ভরা সুর। হয়তো আশ্চর্য একটা প্রেমের সুর।

যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরি, আসলে এই যে টাকার গায়ে অনেকেই প্রেমপত্রের স্টাইলে মোবাইল নম্বর লিখছেন, তা বোধহয় একধরনের সামাজিক ক্রাইসিসকেও আমাদের সামনে ক্রমশ উন্মোচিত করে চলেছে।

সে ক্রাইসিসের নাম হলো হয়তো যে কোন মূল্যেই সংযোগ বা যোগাযোগ গড়ে তোলা। বড় অদ্ভুত লাগে না ব্যাপারটা! এই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা তথ্য-প্রযুক্তির এই মেগা বিস্ফোরণের যুগে, যখন দুনিয়াটা ছোট হতে হতে

হাতের তালুর মধ্যে বন্দি হয়ে যাচ্ছে; স্মার্ট ফোন দিয়ে যখন সারা দুনিয়ার সব ঘটনার সাক্ষী হওয়া যাচ্ছে; সে সময়ে মানুষ, কেনই বা টাকার শরীরে নিজের ফোন নাম্বার লিখবে? আর এই লেখার ভেতর দিয়ে অপরের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চাইবে? এই প্রশ্নের হয়তো অনেক ধরণের উত্তরই হয়, তবু বলবো, আমাদের চারপাশে হয়তো এক গভীর খাদই তৈরি হয়েছে।

বন্ধুদের সঙ্গে এখন নিয়মিত দেখা হয় না 'whatsapp'-এ কথা হয়। ক্রমশ হিউম্যান টাচ থেকে যখন আমরা দূরে – দূরে – আরো দূরে সরে যাচ্ছি; সে সময় হয়তো এভাবে ফোন নাম্বার লেখা, এক ধরনের সামাজিক অসহায়তার ভাষাকেই আমাদের সামনে প্রতীয়মান করে তুলছে। আর যে কোনো অসহায়তার ভাষা, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে, তার ভেতর অসহায়তা কম, সামাজিক অভ্যাসগুলোই হয়তো বা বেশি পরিলক্ষিত হয়। আর যেকোনো অভ্যাসই হয়তো বা এক ধরনের মনোটোনিসিটিরই জন্ম দেয়। এই একঘেয়েমিই হয়তো জীবন আবিষ্কারের গল্পগুলোরও মূল শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যে কোনো আবিষ্কারই তো আসলে, সেই হৃদয়ে নাম লেখার কথাকেই হয়তো বলে। মনোটোনাস সমাজ বলে, 'ওইসব হৃদয়-টিদয় ভুলে যাও, পাথরে নাম লিখে নিজেকে চ্যাম্পিয়ান করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

ফলে জীবন জুড়ে এক আশ্চর্য দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। আর এই কনফ্লিক্টগুলোকে সামাজিক ক্ষমতা হয়তো তার মতো করে ব্যবহারও করতে থাকে। তাই আমরা দেখি মানুষের রোজগার ক্রমশ কমে যায়। অথচ চারিদিকে প্রেমের সেলিব্রেশনও বাড়তে থাকে। টিভি এংক্র থেকে রেডিও স্টেশন হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার কর্ণধাররা, নানা মিঠে মিঠে বাত বলতে থাকে। কিন্তু নিরন্ন মানুষের মুখে ভাত দেওয়ার প্রসঙ্গটি সবাই-ই এড়িয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ যদি খেতেই না পায় পেটপুরে, তার যদি দেহ-মনের বিকাশ নাই ঘটে, তাহলে সে কি করে প্রেম করবে বা প্রেমকে সেলিব্রেট করবে? এ প্রশ্নে সবাই নীরব থাকে।

আর হয়তো যুগে যুগেই এই নীরবতা, এক ধরনের মানসিক সঙ্কটও আমাদের জন্য সযত্নে উপহার দিয়ে যায়। তুরস্কের সেই রাজা যখন জানতে পারে, তার চেয়েও তার বউয়ের সুন্দর ছবি এঁকেছে এক শিল্পী। তখন সে ঐ শিল্পীর গর্দান কাটার হুকুম দেয়। আর রানী বলে, গলা কেটে কি হবে? যে চোখ দিয়ে সে আমায় দেখেছে। সেই চোখ দুটি অন্ধ করে দেওয়ার কথা। অর্থাৎ স্বাভাবিক সমস্ত কিছুকেই, ধ্বংস ও অবরুদ্ধ করে দেয় হয়তো একটা বিকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ফলে যুগে যুগেই মানুষের হুজুগ বাড়তে থাকে, টাকার শরীরে নিজের ফোন নাম্বার লেখা থেকে শুরু করে,

বাঘের গলায় মালা পড়াতে ছুটে যায় মানুষ। আক্রান্ত হয় মানুষ। ফলে ক্রমশই জীবনানন্দ দাশের ওই অদ্ভুত লাইনগুলো হয়তোবা চুপি চুপি আমাদের বলতে থাকেঃ

"মনে পড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার
কহিলাম, শোনো তবে।"

সুতরাং, এই অন্ধকারেই আমাদের জন্য পড়ে থাকে সেই রূপকথা, যে হয়তো বা বলে গাছ বা কাগজ, কোথাও আলাদা করে আমি তোমার নাম লিখবো না। সমস্ত পৃথিবীটাই হবে আমার, তোমার, আমাদের। ■
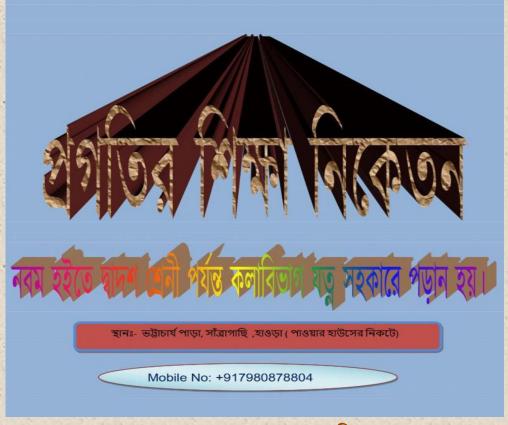
হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ মা যখন কাঁদেন...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

তৃতীয় পর্যায় (২)

"ওঁ নম নর্মদা মাঈ রেবা
পার্বতী বল্লভ সদাশিবা।"

মাকে স্মরণ করে ভোর পাঁচটায় পথে নেমে পড়লাম। সকালে এতটাই তাজা লাগছে যে দিব্যানন্দজীর বেসুরো গানও শুনতে ভাল লাগছে। আজ ২৫ তারিখ, বুধবার আমাদের লক্ষ সাঙ্কল গ্রাম। কিছুটা রাস্তার দু'পাশে চাষ হলেও বাকিটা মরুভুমির মত লাগছিল।

সকাল ন'টার সময় এলাম সাঙ্কল গ্রামে। রাস্তার পাশেই দোকান। ওরাই চা, সিঙ্গাড়া খাইয়ে নদীর পাড়ে আশ্রমের রাস্তা বলে দিল। আরো দু'কিলোমিটার গিয়ে চড়াইতে উঠতে হল, অবশেষে পেলাম আশ্রয়।

অনেকটা উঁচুতে, নীচে দেখা যাচ্ছে আরাধ্যা নর্মদা। এখানে হিরণ নদীর সঙ্গম আদি শঙ্করাচার্যের গুহা, এবং ঋষি মার্কেণ্ডেয়র গুহা আছে। কিন্তু সেটা উত্তরতটে, আমরা দক্ষিণতটে। তাই এ যাত্রায় ওখানে যাওয়া হবে না। এক সময় গ্রামটির নাম ছিল শংকর মহাকাল। লোক মুখে চলতে চলতে আজ নাম হয়েছে সাঙ্কল।

আমরা সঙ্গমে স্নান, তর্পণ করলাম। ঋষিদের প্রণাম করে পরিক্রমার সফলতা প্রার্থনা করলাম, তারপর ফিরে এলাম আশ্রমে।

দুপুরে প্রচণ্ড বৃষ্টির মুখে পড়লাম, পাহাড়ি বৃষ্টি শুরু হলে থামতে চায় না। আজ আর যাওয়া সম্ভব হল না। রাত্রেও খুব বৃষ্টি হল।

"মহাগভীর-নীরপুর পাপধূত ভূতলং
ধনৎ সমস্ত পাতকারি - দারিতাপদাচলম্।"

মা তোমার জলরাশি ভূতলের সব পাপ মুক্ত করুক, জগৎ পবিত্র করো।

প্রচণ্ড পাহাড়ি স্রোত নেমে আসছে, কিভাবে এগিয়ে যাবো বুঝতে পারছি না। তাই মার কাছে সমস্যা মুক্ত করার প্রার্থনা জানাচ্ছি।

খুব ভোরে নদীর পাড় ধরে যেতে বলেছিলেন মহারাজ, তাই চলেছি, কিন্তু পথে এই বিপত্তি। আজ ২৬ তারিখ, আমাদের পরিক্রমার সময় শেষ হয়ে আসছে। এবার বেশী হাঁটতে পারছি না। আজ কতটা পারব জানি না। নদীর পাড় ছেড়ে একটু ওপরের দিকে গেলাম, কিন্তু সে রাস্তাও খুব খারাপ। কাদা সবিনয়ে পা জড়িয়ে ধরছে, কিছুতেই যেতে দেবে না। আমরা পরিক্রামাবাসী, তবু যেতে হবে বলে এগিয়ে চলেছি। একটু আবেগপ্রবণ হলেই রাস্তা থেকে প্রায় দশ ফুট নীচে পড়ে যাব। তিন কিলোমিটার এইভাবে যাওয়ার পরেও রেহাই নেই।

নমামি দেবী নর্মদে

এখান থেকে শুরু হল বাবলা গাছ, আর কুল গাছের জঙ্গল। এদের ভালবাসা আরও গভীর। দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরছে, কিছুতেই যেতে দেবে না। একজনের হাত ছাড়াই তো অন্যজন জড়িয়ে ধরে। ওদের ভালবাসা যে কত গভীর, কত আন্তরিক, বুঝতে পারি যখন দেখি গা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। এগিয়ে গেলেও পিছন থেকে দু'হাত বাড়িয়ে কাপড় টেনে ধরছে, "যেতে নাহি দিব" বলে, কিন্তু আমাদের "তবু যেতে হবে।" কোন ছলনা বা মায়ার ফাঁদে পা না দিয়ে এগিয়ে চললাম। তাছাড়া কোনো গ্রাম বা একটু বসারও জায়গা নেই। কতটা এলাম জানি না, সাড়ে ন'টার সময় এলাম 'ঘানা' গ্রামে।

রক্তাক্ত কলেবরে একটি কলের কাছে দাঁড়ালাম, যারা দেখছিল কি ভাবলো জানি না, জানার সময়ও নেই। ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে মনে হল প্রাণ পেলাম। অশোকবাবু বললেন, "আজ তাঁর গুরুর তিরধান দিবস, কুমারী পুজো করবেন।" একটি দোকানের সামনে বসতেই আমাদের দেখতে অনেকেই এসেছে। ছোট মেয়েদের উনি পুজো করলেন, আমি আর কাকাজীও পুজোয় সামিল হলাম। একটি বাড়ি থেকে আমাদের চা খাওয়াল, আর এক মাতাজী আমাকে কি একটা দিল, আমি বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম। উনি সেটা জানানোর পর, খুব শ্রদ্ধার সাথে বললাম, "গাঁজা, আমি খাই না।" শুনে এমনভাবে তাকালেন

যেন আমি অষ্টম আশ্চর্য। পরিক্রমাবাসী গাঁজা খায় না! উনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

অনেকক্ষণ বিশ্রাম হল, আবার চলা শুরু করলাম, সাড়ে দশটা বাজে, রাস্তা শুকিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সূর্যের তাপ সহ্য করা যাচ্ছে না। খুব কষ্ট করে এগিয়ে চলেছি, বারোটার সময় এলাম পিপারিয়া গ্রামে। নর্মদার পাড়ে, এখানে একটি বর্ধমান শিবলিঙ্গ দেখলাম। বর্ধমানে পাওয়া যায়, তাই ঐরকম নাম, সেটা নয়। আসলে একটু একটু করে বড় হয়, তাই অমন নাম। এই ধরনের শিবলিঙ্গ আমি কলকাতার কাছে আমার এক সহকর্মীর বাড়ীতে আগেও দেখেছি। আস্তে আস্তে বড় হয়, একটা তামার পাত্রে রাখার পরে আর বাড়েনি, ঐ পাত্রের মাপই ধারণ করে থেমে যায়। আরও এক কিলোমিটার নদীর পাড় ধরে গিয়ে বাহান্নটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আশ্রম। মহারাজ আমাদের দেখে খুশি হলেন না। বললেন ভোজন এর পরেই চলে যেতে। কাকাজীর অবস্থা খুব করুন।

“অলক্ষ-লক্ষ-লক্ষ পাপ-লক্ষসারসায়ুধং
ততস্তু জীবতন্তু-ভুক্তি-মুক্তি দায়কম।”

সাধুটির জন্য মা নর্মদার কাছে কৃপা প্রার্থনা করে, একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। নদীর পাড় ধরে চলেছি। অশোকবাবুর উৎসাহ দেখার মত। পরে এই উৎসাহের কারণ বুঝলাম। মাঝে-মাঝেই বাড়ি থেকে ফোনে প্রেরণা আসছে।

নদীর পাড় ধরে চলেছি, এখানে আর এক বিপদ এসে

উপস্থিত, পারথেনিয়ামের জঙ্গল। হাঁপানি আর দুরারোগ্য চর্ম রোগের আঁতুড় ঘর এই পারথেনিয়াম গাছ। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর ফাঁকা জায়গা পেলাম। সন্ধ্যা হতে কিছুটা দেরি আছে, অশোকবাবু আর দিব্যানান্দজী কিছুটা আরও এগিয়ে যেতে চাইলেও কাকাজীর শরীর চলছে না। কানাইয়া গ্রামে এক রাম মন্দিরে রাত্রি বাস করলাম। মহারাজ ঘনশ্যামজী আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন।

নর্মদে হর। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।
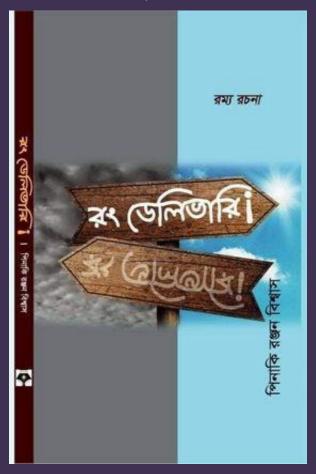
শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

দাদুর বাংলাদেশে আগমন

(৫ম পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

বাস চলছে নাটোর থেকে রাজশাহীর পথে। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে। এমন আবির রাঙা আকাশের ছোঁয়ায় এক অদৃশ্য বনলতা যেন আমাদের কানে বলছে, **'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার যাবার আগে, রাঙিয়ে দিয়ে যাও...'**

পাখিরা নীড়ে ফিরছে; আমরাও ফিরে যাচ্ছি রাজশাহীতে। বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে দেখতে পাচ্ছি সন্ধ্যার আগে মানুষের আনাগোনা। দূরের গ্রাম দেখে মনে হচ্ছে — গ্রামের যে শিকড় আমাদের অন্তরাত্মায় গ্রথিত সে শিকড় যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বাংলার সব গ্রাম আমাদের নিজস্ব গ্রাম বলে মনে হয়।

একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। উদাস হয়ে দাদু বললেন, "জানো দীপুদা, সেদিন তো গ্রাম বাংলার শব্দভাণ্ডার শেষই করতে পারলাম না। মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে, সেই কাঁপার ঠকঠক শব্দ তো তোমরা শুনলেই না কোনদিন। শোনো তাহলে বলি, আমাদের সেইসব দিনরাত্রি পৌষপার্বণ ও বাংলার নিজস্ব শব্দের কারসাজি।"

উৎস

"পৌষ সংক্রান্তির রাত, ঘন কুয়াশায় ঢাকা পল্লীগ্রাম। শিশিরের টপটপ শব্দ যেন এক মোহময় সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। আমার চোখে ঘুম নেই। ঘুম থাকবেইবা কেন রাত শেষ হলেই যে পৌষপার্বণ। পিঠা খাওয়ার উৎসব। এমন উৎসবে বাচ্চাদের আগ্রহের কমতি থাকে না। সেই রাত আমাদের কাছে শেষ হতেই চায় না। জেগে থাকতে থাকতে আমিও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পাই পাশের বাড়ির চন্দনদার নাক ডাকার শব্দ। পুরুষমাত্রই নাক ডাকে নাকি মানুষমাত্রই নাক ডাকে সেটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে। তবে, মেয়েরা কখনোই স্বীকার করবে না তারা নাক ডাকে। ইচ্ছে করছে আমার আঙুল দিয়ে চন্দনদার নাকটা সজোরে টিপে ধরি। কালকের দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও বুঝতে পারিনি। খুব ভোরে আবার ঘুম ভেঙে যায়। সেটা আর নাক ডাকার শব্দে নয়; ঢেঁকির ধপাস ধপাস শব্দই ঘুম ভাঙার কারণ। মা-মাসীরা ঢেঁকিতে আটা কুটছেন। সেই আটা হতে পিঠা তৈরি হবে। কিছুক্ষণ পর দূর হতে ভোরে আজানের ধ্বনি কানে আসছে। প্রকৃতির মতোই পবিত্র এক ধ্বনি। তখনো পল্লীগ্রাম অন্ধকারে ঢাকা। মোরগগুলো অনবরত 'কুক্কুর কু' করে ডেকেই যাচ্ছে। পাখিদের ঘুম ভেঙেছে। পাখিরা যেন কিচিরমিচির স্লোগানে রাজপথে মিছিলে নেমেছে।

উৎস

সকাল সকাল ছেলেরা আজ মার্বেল নিয়ে বসেনি। মাকে ব্যস্ত রেখেছে কখন পিঠা ভাজবে তা নিয়ে। দু একটা বাড়ি হতে গরম তেলের 'শোঁ শোঁ' শব্দ শোনা যাচ্ছে। পিঠা এক-এক করে নামছে আর বাচ্চাটি গপগপ করে গিলছে। অল্প পরেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলছে, আর খেতে পারছি না। আগ্রহ ততক্ষণে বিরক্তিতে রূপ নিয়েছে। পিঠা দেখলেই তখন জ্বর চলে আসে। তৈরি হতে থাকে হরেকরকমের পিঠা। পরের দিন ছাগলের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছাগলটি তখনও জানে না কিছুক্ষণ পরে তাকে জবাই করা হবে। মানুষেরাই মনে হয় মানুষসহ সকল নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের হত্যা করবার ক্ষমতা রাখে। সে অধিকার উপরওয়ালা হতেই প্রাপ্ত অথচ 'শাস্ত্রই বলে জীব হত্যা মহাপাপ।'

প্রিয়া সুর করে কেঁদেই যাচ্ছে। চোখের সামনে ওদের ছাগলকে জবাই করতে দেখে আরো জোরে গলা ছেড়ে কাঁদছে। ওর কান্না শুনে বড়োরা তাচ্ছিল্য করছে; কেউ কেউ সান্ত্বনা দিচ্ছে – অথচ প্রিয়া কোন সান্ত্বনার কথাই কানে তুলছে না। সে পণ করেছে কোনক্রমেই মাংস খাবে না। কিন্তু আমি জানি, রান্না শেষ হতে না হতেই মায়ের কাছে দৌড়াবে বাটি হাতে। মানুষ পণ করে ভাঙার জন্য সেখানে শিশুর পণ তো নিছক খেলা ছাড়া কিছুই না।

রাস্তার ধারে একটি বরই গাছ, গাছ ভর্তি বরই। রাস্তার

ধারে হলেও গাছটা যে সরকারি না, সেটা লিয়ন লিমা বারবার জানিয়ে দেয়। কারণ, ওই গাছটা ওর দাদু নিজে হাতে লাগিয়েছিল। সেইসূত্রে গাছের মালিক ওরাই। সরস্বতী পূজার তখনো আরও কিছুদিন বাকী। বরই খেতে গুরুজনের নিষেধ আছে। বই না পড়লেও সরস্বতী পাশ করিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু পূজার আগে বরই খেলে দেবী সরস্বতী কখনো ক্ষমা করবেন না। তবুও যাদের পাশ-ফেলের ভয় নেই তারা বরই গাছে ঢিল ছুঁড়বেই ছুঁড়বে। এইমাত্র একটা ঢিল ছোঁড়া হলো কিন্তু সেটা বরই গাছে না লেগে পড়লো গিয়ে লিয়নদের বাড়ির টিনের চালে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মা একটা লাঠি নিয়ে দিল এক দৌড়; ওর মায়ের আসা দেখে অমনি উধাও সেই কুলখেকো অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটি।

এভাবে সময়ও দৌড়াচ্ছে সমান তালে। গ্রাম বাংলার শব্দে পরিবর্তন ঘটছে। পুরাতন শব্দের তিরোভাব ঘটছে নতুন শব্দের আবির্ভাবে; প্রকৃতি আবার নতুনভাবে জাগ্রত হচ্ছে। পলাশ আর শিমুলগাছ বউ সেজেছে। কোকিল কুহু কুহু সুরে গাইছে। বুঝতে আর বাকী নেই বসন্ত এসে গেছে। আর সরস্বতীপূজার ধুমটা তো বললামই না সেটা আর একদিন হবে।"

কেমন যেন তন্ময় হয়ে দাদুর কথা শুনছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমরা রাজশাহীতে পৌঁছে গেলাম। ...ক্রমশ ■

বই

মুল্যঃ ৮০ টাকা [এখন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ডেলিভারি চার্জ লাগবে।]

লিঙ্ক (Just copy and paste to your browser):
https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

বই

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'-এর দোকান থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলেজ স্ট্রীটে এবং কলকাতার বিভিন্ন বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

যাতনা

সোমনাথ চৌধুরী

যখন আসে যাতনা মোর অন্তরে,
আমি প্রয়াসী হই স্বান্ত্বনা পেতে
সৃজনীশক্তির অফুরন্ত বিস্তারে –
মোর হৃদয়ে জাগে উচ্ছ্বাস –
মোর বিমর্ষ হৃদয় ভরে ওঠে উন্মাদনায় –
যে উন্মাদনা হয় মোর পথের পথিক,
কাব্যলোকের জগদালোকে।

যাতনা... যাতনা... যাতনা আজ সর্বত্র...
সমভিব্যাহারে আসে যায় সুখের হাত ধরে...
জীবনের একনিষ্ঠ সঙ্গীরূপে।
হৃদয় যার লৌহদৃঢ়, সংকল্প যার অটুট –
সেই হয়তো পারে জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে-
আনন্দের বংশীবদনে জয় করতে।

জানিনা কেন আমার জীবনাঙ্কটা
দুয়ে দুয়ে তিন হয়ে গেল...
নিস্ফলা মরুভূমির মতো...
অনেকটা প্রেমহীন ভালবাসা...

Photo by Dids from Pexels

বাস্তব

শ্মশানের আগুন।
যাতনা আমার চিত্তকে করে তুলল চঞ্চল –

যখন দেখি বাস্তব বাতাবরণের
চাপে আমি জর্জরিত –
তখন নিজের মধ্যে খুঁজে পাই
এক অচঞ্চল অণুপ্রেরণা –
জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতাগুলোকে
প্রদীপ্ত করার অমূল্য রতন –
খুঁজে পাই মোর সৃজনী শক্তির নিরিখে –
মনের বিমর্ষতা দূর করার তরে। ■

Photo by Dids from Pexels

ধারাবাহিক উপন্যাস
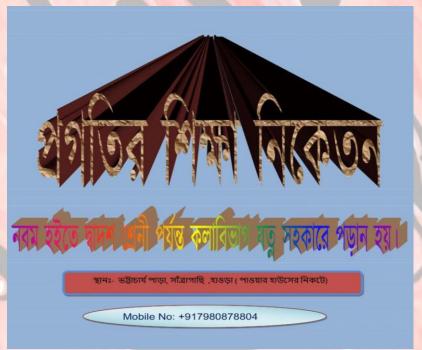
চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৫)

আমরা যখন ভাবি নিজের মতো করে নিজের জীবনের গল্পটা গড়ে তুলব, ঠিক সেই সময় জীবন খাতার পাতাটাই কে যেন উল্টে দেয়! বদলে যায় সব জানা হিসাব। হয়তো সেই বদলটার পিছনে আমাদেরও কিছু ভূমিকা থাকে, আবার অনেক সময় তা না থাকা সত্ত্বেও আমরা হয়ে যাই সেই বদলের মুখ্য বা অন্যতম কারণ। পিকুর জীবনেও সেরকম ঘটনাই ঘটল। তার নিজের প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও বদলে গেল তার জীবন।

যে সুন্দর সন্ধ্যায় স্বপ্নের আঁকিবুঁকি দিয়ে সময় কাটাবে বলে শহর থেকে অনেকটা দূরে এসেছিল পিকু আর রোহিণী, সেই স্বপ্নে ধূলিঝড় উঠল একটা ফোন কলে। অবশেষে পিকু রোহিণীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। যদিও রোহিণীও পিকুর সাথে তার বাড়ি যাবে বলে জেদ ধরেছিল, পিকু কোন এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে রোহিণীকে নিয়ে গেল না।

কলকাতা শহরের বুকে এখন আর পুরানো সাবেকি বাড়ি নেই বললেই চলে। সব-ই প্রায় বহুতলার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র

প্রাণহীন বাসা। আর যদিওবা কিছু সাবেকি বাড়ি প্রমোটারদের চোখ এড়িয়ে বেঁচে আছে, তারাও বার্ধক্যের জীর্ণ দশায় ক্ষয়ের পথে। পিকুদের সাবেকি পুরানো বাড়িটাও আর নেই। কলকাতায় এসে তাদের জুটেছিল এক কামরার একটা ঘর। তাদের সরিকরা তাদের ঠকিয়ে ফ্ল্যাট করে নিয়েছিল। অবশ্য সেই ফ্ল্যাটে তাদের জায়গা হয়েছিল বটে, তবে ভাড়াটিয়া হিসাবে। বর্তমানে তারা ওই ফ্ল্যাটেই স্থায়ী ভাড়াটিয়া।

পিকু বাড়ি এসে দেখে, বাড়ির পরিবেশটা বেশ চুপচাপ। তার মা তাকে দেখে বলেন, "এতোক্ষণ পরে তোর আসার সময় হল? না ঘরের, না নিজের কোনো ব্যাপারে তোর হুঁশ আছে। সারাদিন কোথায় থাকিস? বোন না ফোন করলে তো তোর বাড়ি ফেরার হুঁশই থাকতো না।"

পিকু বলল, " হ্যাঁ বোন ফোন করেছিল, কিন্তু পুরো কথা বলার আগেই ওর ফোনটা তো কেটে গেল। তারপর থেকে বোনের ফোনটা সুইচ অফ বলছে। এখন কি হয়েছে বলো তো? বাবার শরীর খারাপটা কি বেড়েছে নাকি? আমি যাই দেখি আসি।"

ঘর থেকে পিকুর বোন মৌ বেড়িয়ে এসে বলল, "কোথাও যেতে হবে না। আগে তুই আমার কথার উত্তর দে তো, শেষ কবে মেলগুলো চেক করেছিস বল তো?"

পিকু কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বলল, "কেন, এই তো দশ দিন

আগে হবে। কিন্তু তুই কি এই আজেবাজে কথা বলার জন্য ডেকেছিস?"।

"আর সময় পাসনি মেল দেখার...!"

এবার কিছুটা বিরক্ত হয়ে পিকু বলল, "না মানে ওই আর কি... তোর ব্যাপারটা কি বলতো? আমি তোর জন্য হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

"ব্যাপারটা হল তোর একটা মেল এসেছে... এই তিন দিন আগে। তুই তো সেই মেলটা দেখিসনি। আমি আজ দেখলাম যে মেলটায় লেখা আছে... তুই চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিস। তোর দিল্লিতে পোস্টিং।"

পিকুর এতদিনের স্বপ্নটা অবশেষে সত্যি হল। আনন্দে বুকের ধুকপুকুনিটা যেন চারগুণ বেড়ে উঠল। নিজের কানকেই কোনভাবে বিশ্বাস করতে পারল না সে। তখনি ছুটে গিয়ে সে মেল চেক করল। তবে সমস্যা যেটা হল দু'দিন পরেই যেতেই হবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি করে সব সম্ভব হবে তা ভেবে তার আনন্দটা একটু মুছরে গেল।

পিকু ভাবতে লাগল, এত কম সময়ে টাকার জোগাড় করবে কি করে? কারণ কলকাতায় যখন তারা এসেছিল, তখন তারা প্রায় নিঃস্ব ছিল বলা যায়। তবু জীবনের কাছে হার মানেনি তারা। পিকুর দাদু ও বাবা মিলে একটা ছোট দশকর্মার দোকান খুলেছিল, জমানো কিছু টাকা দিয়ে। সেইটি এখন তাদের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন। তবে

ইদানিং পিকুও পড়ার সাথে সাথে উপার্জন করে কম বেশি পরিবারকে সাহায্য করে। কিন্তু যাওয়ার জন্য একেবারে এতগুলো টাকা জোগাড় করার কথা ভেবেই পিকু বেশ চিন্তায় পড়ল। মাত্র একটা দিন হাতে তার মধ্যে সব কিছু জোগাড় যেকোনভাবে-ই হোক তাকে করতে হবে। কেননা চাকরিটা কোনভাবে হাতছাড়া করা যাবে না।

টাকার জোগাড়ের চিন্তায় রোহিণীকে সেই কালকে তার বাড়ি ছেড়ে আসার পর, সবটা যে জানবে, সেটাই ভুলে যায় পিকু। এদিকে রোহিণী কাল থেকে প্রায় ৫০ বার পিকুকে ফোন করে না পেয়ে কি করবে ভেবে পায়না। একবার ভাবে পিকুর বাড়ি গিয়ে দেখবে, আরেকবার ভাবে না জানিয়ে পিকুর বাড়ি যাওয়াটা কি ঠিক হবে? এইভাবে সাতপাঁচ ভেবে দ্বিধা-উদ্বেগ নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে রোহিণী।

"আরে রোহিণী তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিস, পিকুর বাড়ি!" পথে পিকুর বন্ধু রক্তিম বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করল।

রোহিণী সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পিছনে ফিরে বলল, "ও রক্তিমদা, হ্যাঁ পিকুর বাড়ি যাচ্ছি।"

রক্তিম হাসতে হাসতে বলল, "আচ্ছা পিকুর চাকরির খবরটা পেয়ে নিশচয়ই আর ধৈর্য রাখতে পারিস নি। পারিস বটে।"

"চাকরি? কি বলছ রক্তিমদা!" রোহিণী অবাক হয়ে জানতে চাইল।

"থাক, আর না জানার ভান করতে হবে না। পাড়ার সবাই

জেনে গেল আর তুই জানবিনা! এই তো একটু আগে পিকু আমার কাছ থেকে ব্যাঙ্কের কিছু কাগজ সাইন করিয়ে নিয়ে গেল টাকা তুলবে বলে। তুই যা ওর বাড়ি। আমি অফিস চললাম রে। আর হ্যাঁ, এবার তাড়াতাড়ি তোদের বিয়ের পার্টিটাও খাওয়া হবে, কি বলিস?" এই বলে রক্তিম হাসতে হাসতে চলে গেল।

রোহিণীর মনে আনন্দের সাথে সাথে যেন একটা অভিমানী ব্যাথার ঢেউ এসে সজোরে ধাক্কা দিল। বারবার মনে হতে লাগল, "কাল থেকে একবারও কি ফোনটা তুলে এই খবরটা পিকু আমাকে দিতে পারত না! কাল সারারাত ওর চিন্তা করে ঘুমাইনি। হঠাৎ করে ফোনটা আসার পর চলে গেল। সারারাত ভেবেছি, বাড়িতে নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। কিন্তু এতো একেবারে উল্টো! এতো ভালো খবরটা আমাকে বলার প্রয়োজনও মনে করল না!" রোহিণীর দুই গাল বেয়ে জলের রেখা ঝরতে লাগল। রাগে, অভিমানে, সে আবার নিজের বাড়ির দিকেই চলতে লাগল। ...ক্রমশ ■

হস্তাঙ্কন
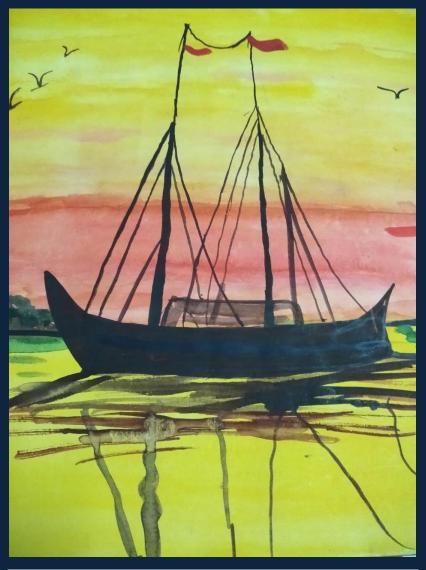
ছবির নামঃ তরণী...

শিল্পীঃ সঞ্জনা দাস ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

আমরা অনেকেই হয়ত 'থ্রী ডি প্রিন্টিং' বা 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' কথাগুলি অনেকবারই শুনেছি, কিন্তু এই নতুন প্রযুক্তি বর্তমানে ঠিক কিভাবে আমাদের সাহায্য করছে আর ভবিষ্যতেওবা কি করতে চলেছে, সে সম্পর্কে অনেকেই হয়তো এখনও সম্পূর্ণরূপে অবহিত নই, তাই আজকে 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' নিয়ে কিছু কথা বলব।

প্রথমেই বলে রাখি, যদিও 'থ্রী ডি প্রিন্টিং' নামটির বাংলা তর্জমা করা হয়েছে 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ', ব্যাপারটি কিন্তু মুদ্রণ (ছাপা) বলতে আমরা যা বুঝি, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ইংরাজী ভাষাতেও এই প্রক্রিয়াটির আরও দু'টি নাম আছে, যথা 'অ্যাডিটিভ প্রিন্টিং' এবং 'র‍্যাপিড প্রোটোটাইপিং', তবে বর্তমানে প্রথম দু'টি নামই অধিক প্রচলিত, কারণ এখন এই প্রক্রিয়াটি আর শুধুমাত্র 'প্রোটোটাইপ' বা মূল বা প্রথম দ্রব্যটি ('the product') বানানোর কাজে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিকে রীতিমত গণ-উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, পরম্পরাগত

পদ্ধতিতে যে দ্রব্য বানানো বা উৎপাদন করা খুবই কঠিন, তা অনায়াসেই এই পদ্ধতিতে বানিয়ে ফেলা যাচ্ছে।

এখন দেখা যাক, এই 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' ব্যাপারটা আসলে কি বা কেমন... আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে – 'ডিজিটাল ফাইল' ('কম্প্যুটার'-এ করা 'ডিজাইন') থেকে তিন-তল বিশিষ্ট কোন বস্তু হুবহু বানানোর পদ্ধতিকে 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' বলা হয়।

চিত্র পরিচয়ঃ '৩ডি প্রিন্টার' (Source: Airwolf 3D)

যে কোন সাধারণ কারখানাতে আমরা দেখি ধাতু বা প্লাস্টিক-এর বড় টুকরো থেকে কোন না কোন প্রক্রিয়ায় কেটে অভিপ্রেত দ্রব্যটিকে রূপ দেওয়া হয়, কাজেই এই পদ্ধতিটি বিয়োগাত্মক ('subtractive') এবং অপচয়মূলক – কাজেই এই পদ্ধতিটি অধিক ব্যয়বহুল। কিন্তু 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' পদ্ধতিটি ঠিক তার উল্টো। এই পদ্ধতিতে কাঁচা মালের ('raw material') একের পর এক স্তর (layer)

সৃষ্টি করে অভিপ্রেত বা আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটি গঠন করা হয়। যে 'মেশিন' বা যন্ত্রের সাহায্যে এই 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' করা হয় তাকে বলে '৩ডি প্রিন্টার' ('3D Printer')। উপরের ছবিটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আজকের দিনে বাজারে ঘরে রাখার মত 'সাইজ'-এও '৩ডি প্রিন্টার' পাওয়া যাচ্ছে। আর বড় জিনিস তৈরির জন্য বড় মাপের '৩ডি প্রিন্টার'তো আছেই। আর কিছুদিনের মধ্যেই ঘরে ঘরে 'কম্প্যুটার'-এর মতোই এটিও একটি অপরিহার্য দ্রব্য বলে পরিগণিত হবে।

এবারে দেখা যাক 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' কি কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ, ছোট পুতুল, খেলনা, বাসন, গহনা থেকে শুরু করে কৃত্রিম হাড় (সমস্থানিক) বানানো পর্যন্ত সমস্ত কাজেই 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ'-এর প্রয়োগ চলছে। কিছু বিশেষ ঘটনার কথা শুনলে হয়ত অনেকেই চমকে উঠবেন...

গত বছর আমেরিকার 'ন্যাশনাল হার্ট, লাঙ্গ, ব্লাড ইন্সটিটিউট'-এর বিজ্ঞানীরা একটি মহান কার্যে আংশিক সাফল্য লাভ করে কৃত্রিম ফুসফুস তৈরির কাজে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। হয়তোবা আর কয়েক বছর বাদে, কোন কারণে ফুসফুস খারাপ হয়ে গেলে, তাকে বাদ দিয়ে, 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' পদ্ধতিতে তৈরি একটা নতুন ফুসফুস মানুষের শরীরে বসিয়ে দেওয়া যাবে! এই প্রয়াসে, প্রথমে একটু অসুবিধা ছিল। বিজ্ঞানীরা 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' পদ্ধতি ব্যবহার করে গঠনগত এবং কার্যগত (হাওয়া চলাচলের

দিক থেকে) সাফল্য পেলেও জটিল রক্তনালী, রসনালী ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু গত বছর সেই দিকেও তাঁরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানীরা একটা মুক্ত উৎসের ('ওপেন সোর্স') 'বায়োপ্রিন্টিং টেকনোলজি' ('bio-printing technology') বানিয়েছেন, যা দিয়ে 'টিস্যু ইঞ্জিনীয়ারিং' ('tissue engineering') করা সম্ভব। এই নতুন প্রযুক্তির নাম 'স্টিরিওলিথোগ্রাফী' ('stereolithography') বা সংক্ষেপে 'স্লেট' (SLATE)। এই প্রযুক্তিতে স্তরে স্তরে একটি 'প্রি-হাইড্রোজেল' দ্রবণ (pre-hydrogel solution) এর দ্বারা মুদ্রণ করে পুরো ফুসফুসটি বানান হয়েছে, যেটা পরে নীল আলোতে রাখলে ঘন (solid) আকার নেয়। এই পদ্ধতিতে ওনারা একটি ফুসফুসের প্রথম সংস্করণ (prototype) বানিয়েছেন, যার মধ্যে দিয়ে বায়ু এবং রক্ত চলাচল করতে পারে। কিন্তু মানুষের ফুসফুস একটা ভীষণ জটিল বস্তু, তাই বিজ্ঞানীরা এর ওপর আরও কাজ করে চলেছেন। হয়ত শীঘ্রই তাঁদের পূর্ণ সফলতার দিনটি এসে যাবে!

গত বছরই আমেরিকার 'নাসা' (NASA – National Aeronautics and Space Administration) পৃথিবীর বাইরে 'রোবট'-এর দ্বারা 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ'-এর মাধ্যমে কিছু বিশেষ মহাকাশ গবেষণার সামগ্রী বানানোর জন্য, আমেরিকারই একটি 'কোম্পানি' 'মেড ইন স্পেস' (Made In

Space, Inc.) এর সাথে ৭৩.৭ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করেছে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী, ঐ সংস্থাটি 'আরশিনট ওয়ান' ('Archinaut One') নামে একটি ছোট মহাকাশ যান ('space craft') বানাবে, যা ২০২২ নাগাদ পৃথিবীর স্বল্প-দূরত্বের অক্ষে স্থাপন করা হবে।

তারপর রোবটের দ্বারা 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' প্রক্রিয়ায়, ওর দু'দিকে দু'টি ৩২ ফুট দীর্ঘ বীম ('beam') তৈরি করা হবে। পরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ওখানে রাখা হবে অধিক ক্ষমতাশালী 'সোলার সেলস' (solar cells)। এ উদ্যোগটি আমেরিকার চন্দ্র-থেকে-মঙ্গল ('Moon to Mars') অনুসন্ধান ক্রিয়ায় সহায়তা করবে। সাথে সাথে ভবিষ্যতে ওখানে পুরানো খারাপ হয়ে যাওয়া 'স্যাটালাইট'-এর কিছু 'পার্টস' ঠিক করার কাজও হবে। 'অ্যান্টেনা' তৈরি বা বড় টেলিস্কোপ তৈরির কাজ ও ওখানে করা হবে। এ এক সুদীর্ঘ এবং ক্রমবর্ধমান পরিকল্পনা।

রোজ আরও কত জায়গায় যে 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ'-এর প্রয়োগ শুরু হচ্ছে, তা সত্যই বলা কঠিন। তবে ভবিষ্যতে, মোট উৎপাদিত ইঞ্জীনিয়ারিং পণ্যের একটি বৃহদাংশ যে 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ'-এর দ্বারাই সম্পাদিত হবে, তা আজ অনায়াসেই বলা যায়। আরও আশা করা যায় যে ছুঁচ থেকে বিশালাকার যে কোন জিনিসই তৈরির কাজেই 'ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ' পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ শ্রী গণেশের পূজা আর হাতীকে বোম্ব, বিচিত্র!

শিল্পীঃ রুদ্র দাস ✧ বয়সঃ ৯ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

কিছু কথা

অনিমেষ বৈশ্য

যুক্ত দিয়েগো মারাদোনা মান্যবরেষু,
(যেদিন তুমি কাঁদছিলে)

গুরু, কেঁদো না।

ঈশ্বর কাঁদে নাকি? তুমি কাঁদলে আমরা যাই কোথায়? মনে হচ্ছিল, একটা শোকগাথা লিখি। মারাদোনার চোখে জল। পারলাম কই! সেই ৮৬-তে তুমি জিতেছিলে। তারপর ৩৪ বছর পার। কেউ কথা রাখেনি।

সেই ৮৬... ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। তখন ডাকঘর ছিল, টেলিগ্রাম ছিল। হলুদ খামে লিখেছিলাম শ্রীযুক্ত দিয়েগো মারাদোনা মান্যবরেষু। তারপর একটা অক্ষরও লিখিনি। সাদা পাতা — কত না-বলা বাণী! বর্ষার ঘন যামিনীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম একলা। সেই চিঠি তুমি পেয়েছিলে গুরু? হয়তো পেয়েছ... হয়তো পাওনি... তোমার চরাচর জুড়ে হলুদ খাম। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আমি তখন অবাক পোস্টম্যান। বারতা দিয়েছি তোমায় — দিয়েগো, দিয়েগো।

সেই ৮৬... পাড়ার সব বাড়িতে টিভি নেই। তখন রাত ১১টা অনেক রাত। বাঙালি লুঙ্গি পড়ত কিংবা পাজামা।

চিঠির আড়ালে

বারমুডা মানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। ঋত্বিক মানে ঋত্বিক ঘটক রোশন নয়। কারও কোনও তাড়া নেই। নিঝুম দুপুর। ফেরিওয়ালার হাঁক। হয়তো কোনও বিজন বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে এক উদাস কিশোর। যদি একবার দেখা যায় ফুলি, টুসি অথবা মিনিকে। তখন তুমি ছিলে গুরু। মধ্যরাতের সূর্যোদয়ের মতো ছিলে। সবুজ বনে খরগোশের মতো ছিলে। ফসলের খেতে সোনালি শস্য হয়ে ছিলে। সাইকেলের ঘন্টিতে মিয়ামল্লার হয়ে ছিলে। তুমি দিয়েগো, দিয়েগো।

কেঁদো না গুরু। তুমি কাঁদলে আমার সেই দিনগুলি কাঁদে। সে আমার বড় প্রিয় দিন। রোদেলা দুপুরে উদাস হাঁটার দিন। প্রেমিকাকে সাতশো চিঠি লিখে ফেলেছি। কিন্তু পোস্ট করিনি একটাও। ভয়... যদি ফিরিয়ে দেয়। হয়তো সে ভালোবেসেছিল। জানা-অজানার সংশয় ছিল। আটপ্রহরের ধুকপুকুনি ছিল। আঙুলে আঙুলে একবার ছোঁয়া লাগলে রবিঠাকুরের গান ছিল। আর তুমি ছিলে গুরু।

সেই ৮৬... তখনও ঘুরে-ফিরে আসত উত্তম-সুচিত্রা। যাকে ভালোবাসি সে গেছে ম্যাটিনি শোয়ে। আকাশভাঙা বৃষ্টি। চৌদিক ঝাপসা। এমন দিনে তারে বলা যায় — কী বলব? যখন বলতে যাব, হয়তো তখন মেঘ ডাকল, হয়তো তখন উত্তমকুমার গেয়ে উঠল, ‘যদি দেখো নীড় ভেঙে দিতে আকাশে ওই আসে ঝড়...’ তখন তুমি ছিলে। তোমার ‘ঈশ্বরের হাত’ ছিল। তোমার পায়ে ছিল এক অনন্ত তাপহরা,

তৃষাহরা, সঙ্গসুধা। তুমি কাঁদলে আমার সেই দিনগুলি কাঁদে। আমি পারি না গুরু। এ আমি দেখতে পারি না।

তুমি যখন চোখ মুছলে আমার মৃত স্বজনের কথা মনে পড়ছিল। তিনি আমাকে কাঁধে চড়িয়ে জিলিপি খাওয়াতেন, বর্ষার ভেজা মাঠে পুঁতে দিতেন দুরন্ত কৃষ্ণচূড়া। ভেরেন্ডার ডাল ভেঙে বলতেন এখানে স্বপ্নরা ওড়ে। আমি জানি তুমি রেললাইনের জন্য কাঁদছিলে, মেঠো ইঁদুরের জন্য কাঁদছিলে, লক্ষ লক্ষ নীল বুদবুদের জন্য কাঁদছিলে।

ওই সব বুদবুদ, ওই সব নীল মাছি আমার কপালে বাসা বেঁধেছিল। আমি ময়দানের দিকে হাঁটছিলাম। কৃষ্ণবর্ণের তেজি ঘোড়ারা তাকিয়েছিল নক্ষত্রের দিকে। রাশি রাশি চিঠি গত জন্মের জ্যোৎস্নায় ভাসছিল ইতিউতি।

তুমি গুরু নিজেই এক অবাক চিলেকোঠা। এখানে ভাঙা হাতপাখা আছে, বাতিল হুঁকো আছে, মরচে পড়া রামদা আছে। আর আছে এক ভাঙা খাঁচা। এখানে নষ্ট বিহঙ্গের বসত ছিল। এখানেই ছিল আমার গুলতির গুলি।

আমি জানি তুমি কেন কাঁদছ। তুমি হারানো দিনের জন্য কাঁদছ। তুমি সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ দেখে কাঁদছ। তুমি সেই ভাঙা খাঁচার জন্য কাঁদছ। আমি জানি, তুমি মাঠে নেমে পড়তে চাইছিলে, মাঝমাঠ থেকে বল ধরে ভূলোক তোলপাড় করতে চাইছিলে। একবার যদি নেমে পড়তে গুরু... তা হলে আবার ছিয়াশি, আবার নিঝুম দুপুর, আবার সাতশো চিঠি।

চিঠির আড়ালে

আমি জানি তুমি কেন কাঁদছিলে। যেদিন আমার ঘুলঘুলিটা ভেঙে গেল, একটা চড়াই এসে বসেছিল ঘরে। ওকে ঠিক তোমার মতো লাগছিল। ঠিক তোমার মতো। বাসা ভেঙে গেলে সবার মুখে মেঘ ঘিরে আসে গুরু তোমার – চড়াইয়ের। তুমি চলে যাচ্ছ। পিছনে হাঁটছে হাতপাখা, রামদা। বাতাসে কিছু শুনতে পাচ্ছ গুরু? নবমী নিশির মতো একটাই ধ্বনি। একটাই প্রতিধ্বনি----দিয়েগো দিয়েগো। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালির তুমি ফুটবল

বিজয় নারায়ণ চৌধুরী

অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে শ্রদ্ধেয় ফুটবলার প্রদীপ ব্যানার্জি (পিকে) ও চুনী গোস্বামী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরকালের মত। দুজনেই আমাদের কাছে ফুটবলার হিসেবে হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। এই ক্ষতি অপূরণীয়। আমাদের যৌবনে পিকে, চুনী, বলরামকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত তর্ক-বিতর্ক হত। বলরাম এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। ছাত্র জীবনে এঁদের খেলা দেখার জন্য কি উন্মাদনাই না আমাদের মধ্যে ছিল, তখনই উপলব্ধি করেছিলাম বাঙ্গালির কাছে ফুটবল খেলা দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা গোষ্ঠ পাল, শিবদাস ভাদুরী, বিজয় দাস ভাদুরীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁরা আমাদের কাছে অনেক দূরের মানুষ। তাঁদেরকে আমরা প্রণাম জানাই। কিন্তু পিকে, চুনী, বলরাম, কৃশানু, হাবিব-আকবর আমাদের অন্তরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন।

ভাবতে আরম্ভ করলাম কিভাবে বাঙালির জীবনে ফুটবল খেলার আবির্ভাব ঘটলো, এটাতো বিদেশী। খেলার ইতিহাস খুঁজতে শুরু করলাম। পেয়েও গেলাম, পুরনো আনন্দবাজার পত্রিকার একটি লেখায়। সালটা ১৮৭৭, সেই সময় বড়লোকদের অনেকেই গাড়ি নিয়ে ময়দানে বেড়াতে যেতেন।

সেরকম একদিন একটি ৮ বছরের ছেলে গড়ের মাঠে আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ফোর্ট-উইলিয়ামের পাশে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মাঠে গোরা সৈন্যদের ফুটবল খেলা দেখে গাড়ি থেকে নেমে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। হঠাৎ বলটি কোনো গোরাসৈন্যদের পায়ে লেগে ছেলেটির পায়ের কাছে এসে পড়লো, ছেলেটি ভয় না পেয়ে গোরাসৈন্যদের মত পা দিয়ে মেরে ফেরত পাঠিয়ে দিল। বাঙ্গালির পায়ে এটাই প্রথম ফুটবল শট। ভারতেও প্রথম। এই ৮ বছর বয়সী ছেলেটির হাত ধরেই ফুটবল জগতে বাঙালির প্রবেশ। এই ছেলেটির নাম নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। এই নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন হেয়ার স্কুলের ছাত্র। পরের দিনই একটা ফুটবল কিনে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে শুরু করলেন, কিন্তু তাঁরা এই খেলা কিভাবে খেলতে হয় জানতেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ব্রিটিশ প্রফেসর এঁদের আনাড়ি খেলা দেখে কিভাবে ফুটবল খেলতে হয় শিখিয়েছিলেন। বলতে গেলে এই প্রফেসরই ভারতের প্রথম ফুটবল কোচ। এভাবেই বাঙ্গালির ফুটবল খেলা শুরু। নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন তখনকার আমলের ছেলেদের থেকে একটু অন্যধরনের, কিশোর বয়সেই তিনি গড়ে তোলেন কয়েকটি ফুটবল ক্লাব।

ভারতের প্রথম ফুটবল সংগঠন বয়েজ ক্লাব, তাঁর উৎসাহেই তৈরী। এর বেশ কয়েক বছর পরে নগেন্দ্রপ্রসাদ

তৈরি করেন শোভাবাজার ক্লাব। এই ক্লাবের মাধ্যমেই ফুটবল আস্তে আস্তে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় হতে থাকে।

ভারতে প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপ। ১৮৮৯ সালে শোভাবাজার ক্লাব এতে অংশ গ্রহণ করে। বিদেশিদের কাছে হেরে গেলেও ফুটবল শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠার ইঙ্গিত বাঙ্গালির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। ১৮৯২ সালে সব বাঙালি খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত শোভাবাজার ক্লাব খালি পায়ে খেলে নামকরা বিদেশি শক্তিশালী দল ইস্তসারেকে হারিয়ে দেয়। বাঙ্গালিদের কাছে নায়ক হয়ে ওঠেন নগেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁর দলের খেলোয়াড়রা।

১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের আগে ফুটবলে এটাই ছিল বাংলার সবচেয়ে বড় সাফল্য। ১৮৯২ সালে নগেন্দ্রপ্রসাদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তার একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। ১৮৯৩ সালে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ‘‘শিল্ডের’’ খেলা শুরু হয়। তাতে একমাত্র ভারতীয় দল হিসেবে অংশ নেয় শোভাবাজার ক্লাব। নগেন্দ্র প্রসাদের হাতেই বাঙ্গালির হৃদয়ে ফুটবল খেলার প্রদীপ জ্বলেছিল।

এরপর এলো মোহনবাগান ক্লাবের আলো। ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতার মোহনবাগান লেনে তৈরি হয় মোহনবাগান ক্লাব। ১৯১১ সালে ইষ্ট ইয়র্কসায়র নামে বিদেশী দলকে

হারিয়ে ''আই.এফ.এ. শিল্ড' জয় করে মোহনবাগান। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ি। এই জয় ছিল বাঙ্গালির কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো। সারা বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনেও এর প্রভাব পড়েছিল, ব্রিটিশদেরও যে হারানো যায় এ বিশ্বাস জন্মেছিল অনেকের মনে। তখন থেকেই এই খেলা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। একটা বল হলেই হলো, বাইশ জনকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়া যায়, ব্যয়ও অত্যন্ত কম। তখন সবাই খালি পায়ে খেলত। মোহনবাগান ক্লাব কোলকাতা লিগ জয় করে অনেক পরে ১৯৩৯ সালে। এর মধ্যেই বাংলার অনেক মানুষ মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থক হয়ে পড়েন। মোহনবাগান ক্লাব তৈরি হবার দুই বছর পর ১৮৯১ সালে কলকাতায় তৈরি হয় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাব তৈরি হওয়ার পর বাঙ্গালিদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে মাতামাতি আরো বেড়ে যায়। মহামেডান স্পোর্টিংএর খেলা থাকলেই ক্লাব সমর্থকেরা পাগলের মতো খেলা দেখতে ময়দান-মুখী হত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত মহামেডান স্পোর্টিং ভারতের এক নম্বর ক্লাব ছিল। বড় বড় প্লেয়াররা সারা ভারতবর্ষ থেকে এই ক্লাবে খেলতে আসতেন। তাজ মহম্মদ, ওসমান জান, আব্বাস মির্জা, জুম্মা খাঁর নাম মুখে মুখে ফিরত। মহামেডান ক্লাবই একটানা পাঁচবার শিল্ড জিতে ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম। কলকাতা

লিগও তারা প্রথম জেতে ১৯৩৪ সালে।

কলকাতার শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম ১৯২০ সালে। প্রথমে তাঁরা দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে খেলতে শুরু করেন। এই ক্লাবের সব প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন পূর্ব বঙ্গের, যদিও কলকাতায় তৈরি হয়েছিল এই ক্লাব। এই কারণেই এই ক্লাবের নাম রাখা হয় ইস্টবেঙ্গল। ১৯২৫ সালে দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে, নানা বাধা-বিপত্তি পার হয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পায়। এই ক্লাবের নাম পূর্ব বঙ্গের নামে হওয়ায় পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ মানুষই এই ক্লাবের সমর্থক হয়ে পড়েন। ইস্টবেঙ্গল প্রথম লীগ জেতে ১৯৪২ সালে, শিল্ড জেতে ১৯৪৩ সালে। মোহনবাগান, মহামেডান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদের খেলা দেখার জন্য ক্লাব সমর্থকদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা যেত। সবাই ময়দানমুখী হতো ঝড়-জল উপেক্ষা করেই। কোনো বাধাই তাদের কাছে বাধা মনে হতো না। ইস্টবেঙ্গল টিমের ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ খান ও সালেকে বলা হতো পঞ্চপান্ডব। এদের জন্য ইস্টবেঙ্গল ১৯৪৩-১৯৫৩-র মধ্যে লীগ, শিল্ড, রোভারস, ডুরানড এবং ডি.সি.এম কাপ জেতে। এটা একটা রেকর্ড। ১৯৪৮ সালে মোহনবাগান ক্লাবের প্লেয়ার টি. রাওয়ের নেতৃত্বে ভারত প্রথম লন্ডনে অলিম্পিকস খেলতে যায়। সেই টিমে শৈলেন মান্নাও ছিলেন। তাঁরা ভাল খেলেও ফ্রান্সের

কাছে ২-১ গোলে হেরে যান। ভারতের প্লেয়ারদের খালি পায়ে খেলা দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। হাসতে হাসতে টি. রাও সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "সব দল বুটবল খেলে আমরাই একমাত্র ফুটবল খেলি।" এই কথা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

অনেক নামী প্লেয়ার এই ক্লাবগুলিতে খেলে গেছেন। কিন্তু চুনি, বলরাম, হাবিব, আকবর পরবর্তীতে কৃশানু-বিকাশ জুটি সমর্থকদের হৃদয়ে রয়ে গেছেন। অতি অল্প বয়সে আমরা কৃশানুকে হারিয়েছি। এটা ভাবলেই মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। চোখের উপরে ভেসে ওঠে তার অতুলনীয় ক্রীড়া দক্ষতা। বিদেশি প্লেয়ারদের মধ্যে চিমা ওকেরি, ওমেলো, এমেকা, ব্যারেটো ও আরো অনেক প্লেয়ার খেলে গেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ দর্শকের কাছে মজিদ বাস্কর ও জামশেদ নাসিরিই সবার উপরে। এদের সবার খেলা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, এটাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

আবার ফিরে আসি যাদের নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, আমাদের কাছে চুনি মানেই মোহনবাগান, বলরাম মানেই ইস্টবেঙ্গল আর পিকে মানেই ইস্টার্ন রেল। চুনি ছিলেন খেলার জগতের নায়ক, মাঠ ও মাঠের বাইরে তাঁর চলাফেরা ছিল নায়কোচিত। মাঠে তার ড্রিবলিং, পাসিং, শুটিংএর মধ্যেও ছিল মাধুর্য অন্যদের থেকে একদম আলাদা। প্রদীপ

ব্যানার্জি কোনদিন কোন বড় ক্লাবের হয়ে খেলেননি। কিন্তু নিজের অসাধারণ প্রতিভায় সবসময় ভারতীয় দলে অপরিহার্য ছিলেন। চুনী, পিকে, বলরামকে বাদ দিয়ে তখন কোন টিম ভাবা যেত না। চুনী ছিলেন ১৯৬২ সালে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক আবার ১৯৬০ সালে অলিম্পিকসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন প্রদীপ ব্যানার্জি।

চুনী ছিলেন ক্রিয়া জগতে অলরাউন্ডার, তিনি ফুটবল ও ক্রিকেটে বাংলাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কৃতিত্ব আর কারো নেই। তিনি লন্ টেনিস ও খুব ভালো খেলতেন। আবার প্রদীপ ব্যানার্জি প্লেয়ার হিসেবে যেমন শ্রেষ্ঠর দলে তেমনি কোচিংএও। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে কোচিং করে সফলতার শিখরে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। রহিম সাহেবের পর এত বড় ফুটবল কোচ ভারতে আর জন্মায়নি। খেলা ও কোচিংএ পিকে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চুনি ও প্রদীপ ব্যানার্জীর স্থান আর কোনদিন পূরণ হবে বলে মনে হয় না। তাঁরা থেকে যাবেন আমাদের অন্তরে।

বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ঘোরসওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়ে টিকিট কেটে কাঠের গ্যালারিতে বসে প্রিয় ক্লাবের খেলা দেখার আনন্দই আলাদা। বর্তমানে টিভিতে খেলা দেখি, কিন্তু মাঠের সেই আনন্দের খেলা দেখা আজও ভুলতে পারিনা। মাঠে গিয়ে প্রিয় প্লেয়ারদের খেলা

দেখতে পেরেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। কোন খেলার কথা ভাবলেই, মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখার ছবি চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নতুন প্রজন্মকে আর কাঠের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে হয় না, টিকিট কাটতে গিয়ে লাইনে ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়াও খেতে হয় না। কলকাতায় তৈরি হয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। নানা শহরে তৈরি হয়েছে স্টেডিয়াম। নবীন দর্শকদের কাছে আবার তাঁদের প্রিয় নতুন নতুন প্লেয়ার তৈরি হবেন। তাঁরাও আবার তাঁদের প্রিয় ক্লাবের খেলোয়ারদের নিয়ে মাতামাতি করবেন। খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়াম ভরিয়ে তুলবেন। প্রিয় দলের সমর্থনে চিৎকার করবেন, প্রিয় প্লেয়ার নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিতর্ক হবে। এটাই বাঙালির ক্রীড়া জগতের প্রবাহমান ছবি। এটা চলতে থাকবে, এই কারণেই স্বর্গীয় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গানটি মাথায় রেখে এই লেখার নাম দিয়েছি— “সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল।” ■

মহাপ্রস্থান

নন্দিতা চৌধুরী

রাতের আঁধার চিরে
জোনাকি চলেছে উড়ে,
নিশীথের মখমলে খেয়ালীপনায়,
অজস্র নক্ষত্র রাজি পাল্লা দিয়ে ধরে বাজি
আলোক দানে রত আঙ্গিনায়।

বংশধরেরা শয্যায়,
অচেতন রয়েছে
ঘুমঘোরে.
স্বপ্ন ডানায় বুঝি উড়ে চলেছে তারা,
দূরে, সুদূরে।

আমি শুনছি
প্রাচীনের পদধ্বনি
অদেহী আত্মার,
সুখী আচরণে
বুক জুড়ে।

আমার একান্ত এই ক্ষণকে,
করে তুলেছে তারা,
বেদনামথিত স্মরণিকায়!

শূন্যতা

খসে পড়া অবসর
নীর হয়ে, করে টলোমলো,
আঁখির পাতায়!

অন্ত্যেষ্টি করেছি সাধন মৃত্যুতে,
এই ভেবে প্রবোধ হয়।
দেয় না পীড়া তাই,
পূর্বজের মর্যাদাপূর্ণ
স্বাভাবিক লয়!

আজ সময়ের উদ্ভট থাবায়,
মানবজাতি দিশাহারা।

ছেদেই প্রাপ্তি,
ছেদেই বিচ্ছেদ,
আজ বিচ্ছেদে মানুষ
কাঁধহীন, হাতছাড়া!

মৃত্যুর দেখেছি,
সামাজিক পরম্পরায়
নান্দনিক মহাপ্রস্থান।
ছিল না মৃত্যু ভয়!
কবির অনুপ্রেরণায়
মেনেছি,
"মরণ রে, তুহু মম শ্যাম সমান..."

শূন্যতা

পরিচিত জনের অগোচরে,
বিভীষিকাময় মৃত্যুর
কুহক জালে,
লুপ্ত আজ জীবন!
শেষকৃত্যের জন্য
প্রিয়জনের
নিষ্প্রাণ দেহ ভিক্ষায়
আজ আপন জনের
ক্রন্দন!

মানুষ আজ হৃদয়-হীন, আত্মা-হীন,
মৃত মানি নির্বিবাদে।
ব্রহ্মহীন দেহ বাঁচে,
দেহের জীবন রক্ষার্থে,
লেখা আছে,
গ্রীক প্রবাদে!

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আছড়ে পড়ে, বিবেচনাধীন
এমন হাজার প্রশ্নের ঢেউ।
রাত্রি, ঝিল্লি, খদ্যোত,
আমি,
সমাধানহীন,
আর কোথাও নেই কেউ! ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ বেদুইন...

শিল্পীঃ সৌহার্দ্য চৌধুরী ✧ বয়সঃ ৭ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

বুড়ো বয়সে হাতে খড়ি*

নবীন চৌধুরী

সেটা সম্ভবত 1994 সাল। ম্যাকউইলিয়াম স্কুলের গোল্ডেন জুবিলি উৎসব। স্কুলের তখনকার হেড মাষ্টারমশাই অর্থাৎ সমীরদা ও আরও ক'জন মাস্টার মশাই মিলে সকালবেলা আমার অফিস কাম বাড়িতে এসে হাজির। সবাই চেয়ারে বসবার পর স্কুলের গোল্ডেন জুবিলি উৎসব নিয়ে কথা শুরু হল। স্কুলের বিশাল অঙ্গন যেটা আয়তক্ষেত্রের মতো দেখতে তার উত্তরদিকে মুখ করে গান, বাজনা, আবৃত্তি ইত্যাদির জন্য একখানি বড় মঞ্চ (stage/podium) তৈরি হবে, সামনে সারি সারি করে লোহার ফোল্ডিং চেয়ার থাকবে, তখন অবশ্য আলিপুরদুয়ারে সেটাই রেওয়াজ ছিল। শীতকাল তাই মাথায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে বসবার জায়গাটা যতদূর সম্ভব ঢেকে দেওয়া হবে। মাঠের অপর প্রান্তে ইংরেজি ইউ আকারের ধাঁচে অনেকগুলো বুকস্টল তৈরি করা হবে, যেখানে লোকাল ও কলকাতার নামকরা সব প্রকাশনা সংস্থা এসে বই বিক্রি করবে।

এদিকে আমার অফিসে চা-বিস্কুট দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হল। শেষটায় আশার চেয়ে বেশি দামি একখানা চেক দেবার পর সবাই হাসি মুখে বিদায় নিলেন। তবে যেতে যেতে সমীরদা আমায় বারবার করে বলে গেলেন,

টুকরো স্মৃতি

দেশ-বিদেশ থেকে স্কুলের পুরানো ছাত্ররা আসবে, তুমি অবশ্যই উদ্বোধনের দিন সন্ধ্যা ছ'টার আগে চলে এস, গোল্ডেন জুবিলি বলে কথা। আমি বললাম, "সমীরদা ব্যাবসাপত্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তবে আপনি যখন বলছেন অবশ্যই আসব।"

দেখতে দেখতে উদ্বোধনের দিন এসে গেল। মনে মনে আমি সকাল থেকেই তৈরি হচ্ছিলাম। দুপুরে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে ডাবল সেভ ও শ্যাম্পু করে নিজেকে ঝকঝকে করার অছিলায় একখানা ভাতঘুম দিয়ে নিলাম। বিকেল সাড়ে পাঁচটার সাথে সাথে কোট-প্যান্ট জড়িয়ে ও চকচকে শু-জুতো পরে একখানা চেনাশোনা রিকশা (স্কুটার কিংবা গাড়ি নিইনি) নিয়ে সোজা স্কুলের অনুষ্ঠানে হাজির। অনুষ্ঠানের গেটের সামনে যে সব ছেলেরা রিসেপশনের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় সবাই মিলে ঘেরাও করে আমাকে বলল, "চলুন স্যার, চলুন স্যার" বলতে বলতে মঞ্চের সামনে প্রথম সারিতে থাকা ঠান্ডা চেয়ারগুলোর মাঝামাঝি জায়গায় আমাকে বসিয়ে দিয়ে সবাই মিলে দল বেঁধে ফিরে গেল। মঞ্চে কেউ নেই, পিছনে তাকিয়ে দেখি পুরোটাই গড়ের মাঠ। তবে অনেক দূরে সেই বুক স্টলগুলোর কাছাকাছি বেশ খানিকটা ভীড় রয়েছে। ফাঁকা পরিবেশে আধ ঘন্টা ধরে বসে লোহার চেয়ারের ঠান্ডা আমার পশ্চাৎ-পৃষ্ঠকে জোর বিরক্ত করছিল। শেষটায় দাঁড়িয়ে পড়লাম, দেখি একজন

নিষ্ঠাবান ছেলে আমার কাছে দৌড়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই হেড স্যার কোথায় আছেন।"

ছেলেটি আমায় টিচার্স কমন রুমের কাছে নিয়ে গেল। দূর থেকে সমীরদা আমায় দেখতে পেয়ে, কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কখন এসেছ?"

আমি বললাম, "আধ ঘন্টা ধরে ঠান্ডা চেয়ারে বসে আছি অথচ কাউকে দেখছি না।"

সমীরদা বললেন, "টিমের সবাই এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে, এক্ষুনি শুরু করতে বলছি, ততক্ষণে তুমি এক কাপ কফি খাও।"

আমি জানি সমীরদা বেশ কাজের লোক। আমার পাশের ছেলেটিকে সমীরদা ঈশারা করলেন। অন্যান্য মাস্টারমশাইরা আমার সাথে দু-চারটে কথা বলতে বলতেই, কফি এসে গেল। সমীরদা আমায় কেক বিস্কুট খেতে বলে ছিলেন, আমি রাজি হইনি। ততক্ষণে মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে "দয়া করে আপনারা সবাই নিজের নিজের আসন গ্রহণ করুন।"

কফি খাওয়া শেষ হলে সমীরদা আমায় বললেন, "তুমি গিয়ে জায়গায় বসো। তবে আমার কাছাকাছি ব্যাচের ছেলেরা এলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে" বলে ওই ছেলেটির সঙ্গে নিজের আসনে ফিরে গেলাম। দেখতে দেখতে কিছু সদ্য প্রাক্তনী এবং আশ-পাশের অভিভাবক-অভিভাবিকারা ও তাঁদের ছেলে-মেয়েরা

মিলে চেয়ারগুলো প্রায় ভরিয়ে ফেলল।

ঘোষণা চলছে, "প্রথমে একটি বাচ্চা মেয়ের সুন্দর গান দিয়ে শুরু, তারপর আরও একটি মেয়ের গান, এরপর দু'টি মেয়ের একসাথে নাচ।"

এবারে শুরু হল আসল অনুষ্ঠান। ঘোষণা হচ্ছে, "এখন স্বরচিত কবিতা পাঠ করবেন অমুক চন্দ্র তমুক।" আর্টিস্টের পরনে সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবি, লম্বা লম্বা চুল, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, ঝোলা থেকে বেরিয়ে আসছে স্বরচিত পাঠের কবিতা। এবারে দ্বিতীয়জন এলো, সেই এক পোশাক। তবে সাথে মেরুন রঙের জহর কোট, মাথায় এক ঝাঁক চুল, এরপর ঝোলা থেকে বের হয়ে এল আবৃত্তির জন্য স্বরচিত কবিতা।

"পরবর্তী শিল্পী পরিবেশন করবেন একাঙ্ক নাটক।" হঠাৎ করে কেন জানি না, আমার মন কেমন যেন একজন বিদ্রোহী ছাত্রের রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে। চেয়ার ছেড়ে যেই না কয়েক পা এগিয়েছি – তখনই কাছে এসে হাজির সেই স্মার্ট ছেলেটি। আমি ওকে বললাম, "তোমাদের গ্রীন রুমটি কোন দিকে?" ও আমায় নিয়ে চলল। কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেলাম, সমীরদার সেই শক্তিশালী কবি সাহিত্যকের টিম। মাঝে দাঁড়িয়ে প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা, ফর্সা, ধুতি, পাঞ্জাবির সাথে বোতাম লাগানো খয়েরি রঙের হাফ সোয়েটার, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সেই মনহনায়ক, 'জেনারেল রোমেল,' যাঁর কাঁধে সেই শান্তিনিকেতনই কামান ঝোলানো রয়েছে, মুখে মুচকি হাসি। আর তাঁর চারপাশে ঘিরে রয়েছে লেফটেন্যানট পদ মর্যাদার অধিকারী সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকের দল। ওদের আচরণ দেখিয়ে দিচ্ছে যে ওরা জেনারেলের নির্ভেজাল অনুগত সৈনিক। এবারে আমার পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম "এ টিমে স্কুলের ক'জন আছে?"

ছেলেটি বললে, "স্যার সবাই বাইরের, দু'একজন আমাদের স্কুলের প্রাক্তনী হলেও হতে পারে।" আমার মনের আগুনে ছেলেটি যেন ঘৃতাহুতি দিয়েছে। "আর কথা নয়, চল হেড স্যারের কাছে যাওয়া যাক।"

...ক্রমশ ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল' (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ ই ডিসেম্বর, ২০২০

সীমাবদ্ধতার আস্ফালন ও নব্যতার ভবিষ্যত*

সুমন চক্রবর্ত্তী (বাংলাদেশ)

দেখার ভিতরে অদেখা জিনিসটা সকলের কাছে বেশি দৃশ্যমান। কর্মীর পরিচয় না থাকলেও কর্মহীনের পরিচয় সর্বত্র। যে করে তার কর্মতে কর্মহীনের স্বীকৃতি আসে। পদদলিত হয় কর্মী। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা অনেকটা আনন্দঘন ও নিরাপদ মনে হলেও – ভবিষ্যত ঠিক যতোটা সম্ভাবনার ততোটাই অনিশ্চয়তার। তারপরও আমরা আমাদের বর্তমানকে নিজের আত্মগোঁড়ামীতে ও সংকীর্ণমান চিন্তায় বিপদগ্রস্ত করে তুলি।

অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করার মজাটাই আলাদা। চিন্তাশীলতায় ব্যবহার কম হলে যে শরীরের বিকাশের ক্ষেত্রে কোন চোট লাগে না, সেটা আমরা বুঝি। অন্যকে খাটিয়ে নিজে রাজার মতো চলাটা মন্দ কিসে? সময়ে সৌভাগ্যতো নিজেরই পাওনা থাকে। কিন্তু ভাবা উচিত মানবিক সভ্যতার ধীরে ধীরে যতোটা অবক্ষয় হচ্ছে, যন্ত্রসভ্যতা ঠিক তার বিপরীতে চক্রবৃদ্ধি হারে বিকশিত হচ্ছে। যেহেতু আমরা আমাদের মনকেই নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারছিনা; কি কর্মক্ষেত্রে, কি পরিবারে, কি

সমাজে... আমাদের অস্থিরতা ও হামবড়া ভাবই দৃশ্যমান হচ্ছে। এই সুযোগে যন্ত্র তার আপন গতিতে অনন্য উচ্চতায় পরিশীলিত হচ্ছে। আমরা কি বুঝতে পারছি আগামী তথ্য প্রযুক্তি ও রোবোটিক দুনিয়ায় আমাদের অবস্থান কোথায় হবে?

মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে আমাদেরকে যে এক সীমাহীন প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। হয়তো এমন হবে চাকুরীর বাজারের সিংহভাগ জায়গা দখল করবে যন্ত্রমানবেরা। এখন কর্মজীবনে কর্ম করতে আমাদের যত অনীহা, তারই ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে ন্যূনতম বেতনে উচ্চশিক্ষিত দিনমজুরের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। প্রথম শ্রেনীর পদগুলো দখল করবে যন্ত্রমানবেরা।

শিল্পখাত, বস্ত্রখাত সমস্ত কিছুই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে প্রাইভেসি তথা সিকিউরিটি কোডের কারণে। সমস্ত কিছুই তৈরি হবে পাসওয়ার্ডের আদলে। কি পোশাক, কি চিন্তা-চেতনা, কি যন্ত্রপাতি, কি বসবাসের জায়গা? শেয়ার বাজারের শেয়ারের মতো তখন সকলেই প্রাইভেসি তথা সিকিউরিটি কোড কিনবে। বর্তমানের আই.সি.টি. বিশেষজ্ঞরা যেখানে সফটওয়ার ও ওয়েব সাইট ডিজাইনিং করছেন, তখন এই বিশেষজ্ঞদের কর্মপরিধি কি হবে? এখনই যে আমাদের মানবিক সভ্যতায় এত সমস্যা... হারালে যে পাওয়ার মতো কিছুই থাকে না। কল্পনা আর দৃশ্যমান জগতের মাঝে যখন কোন পার্থক্য থাকবে না, তখন অনুভূতির কি কোন মূল্য

থাকবে? জগতটা চলবে পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত অভিনয়ের আওতায়। এখন যেভাবে বিশ্রাম নিয়ে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ ও আচরনিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে, তখন কি আমাদের এক সেকেন্ড বসার সময় থাকবে? সোফিয়ার মতো একটা রোবটই নিজের অবস্থান থেকে জানান দিয়ে গেল — আগামীতে কি হতে যাচ্ছে? সে নাকি সন্তান চায়। পরিবার হলে তার আরো ভালো লাগবে। কোন অবস্থানে আছেন — বিশ্বাস করেন।

সেই সময় আর বেশী দূরে নয়, যখন থ্রিডি ভার্সনের বদৌলতে কল্পনা হবে বাস্তব আর বাস্তব হবে কল্পনা। চিন্তা করুন, ভাবুন আর অনুমান করুন জাগতিক বিশ্বে এক বিশাল পরিবর্তন আসছে। এখন কথা বলতে পারা ও কথার বিপরীতে শ্রুতিমধুর উত্তর দেওয়াকে বাহাদুরী ভাবি। কিন্তু যখন কল্পনার বিপরীতে বাস্তবতা রূপ লাভ করবে ও যন্ত্রমানবদের কল্পনা বুঝার বোধশক্তি অর্জিত হবে; তখনকার মানবজাতির অবস্থানটা কি হবে ভেবে দেখেছেন একবার?

কম্পিউটারে একপাতা টাইপ করে, একটি বেতনের সেলারী সিট তৈরি করে নতুবা একটি দামী অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহার করাকে আমরা অনেক সময় অমূলক বাহাদুরী হিসাবেই বিবেচনা করি। সামান্য ছবি, শব্দ, ভিডিও ও এনিমেশানিক সম্পাদনা দেখিয়ে আমরা কিছু একটা হয়ে যাই। কিন্তু শব্দ ও ছবির পাশাপাশি অতীন্দ্রিয় কল্পনা ও স্পর্শ যখন সকলের দৃষ্টিগোচর হবে তখন সেলিব্রেটিদের

ডুপ্লিকেট কপির সাথে বাস্তবতাকে মিলাতে পারবো না।

এখন যেখানে শুধু সফটওয়্যার ব্যবহার করে একজন হাজার জন হয়ে কথা বলছে। তখন সফটওয়্যারের জায়গায় ব্যক্তি মানুষের জীবন্ত কার্বন কপি কথা বলবে। বিশ্বাস করতে পারেন কি হতে যাচ্ছে? এক সেকেন্ডের অনুভূতিকে আমরা পুরো দিনব্যাপী উদযাপিত করি। অনেক সময় মাস গড়িয়ে বছর শেষ হয়। তারপরও অনুভবের কমতি নেই। আর ভবিতব্যে বছরের অনুভব সেকেন্ডেই হারিয়ে যাবে।

নবজাগতিক বিশ্বে নিজের অবস্থানকে ধরে রাখতে হলে মস্তিষ্কের যাবতীয় চেতনাকে বিকশিত করতে হবে, তা না হলে আমাদের এই তথাকথিত আস্ফালন শুধু নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মূল্যহীন হয়ে পড়বে আমাদের কথাবার্তার সাথে চিন্তাচেতনা। কারণ আমাদের কর্মহীনতা ও আলস্যকে নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করবে যন্ত্রমানবেরা তাদের গুনগত ও পরিমানগত কর্ম সাফল্যে। পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করা এই যন্ত্রমানবের কর্মক্ষমতা দেখে কি ভবিষ্যতকে অনুমান করা যায় না, যে কি হতে যাচ্ছে? যন্ত্রমানব ও আধুনিক সভ্যতার বিকাশে নিজের অবস্থান তখনি বিবেচিত হবে, যখন আমরা পরিবর্তনশীলতার সাথে পুরোপুরিভাবে খাপ খাওয়াতে পারবো। এগিয়ে চলুন ব্যক্তিত্ব ও নিজের পারদর্শিতায় আগামীর সভ্যতায়নে। সমস্ত কিছুতে অবস্থান ধরে রাখতে স্বীকৃত হোন নিজের বিলাসিত কর্ম-সংস্থাপনে। ■

*(ভবিতব্যের ভারচুয়াল রিয়েলিটিতে এই লেখার সূত্রপাত)

বয়স

অশোক সামন্ত

যতই বাড়ুক বয়স তোমার
কেউ কি বলে বৃদ্ধ!
তাই বলে কি খাচ্ছো শুধু
করলা পেঁপে সেদ্ধ?

বাড়ার যখন বয়স হবে
বাড়তে দাও না তাকে
আর কত কাল ঢাকবে বলো?
কলপ দিয়ে টাকে।

সকাল সকাল হাঁটতে চলো
হাঁটুর ব্যাথা ভাঙতে
ভর্তি হও না লাফিং ক্লাবে
খিলখিলিয়ে হাসতে।

দাঁতের পাটি সাথ দেয় না
তরল খেতে চায়
তাই বলে কি মুরগী-পাঁঠা
দূরে ঠেলা যায়?

এই তো সুযোগ ইচ্ছাগুলোর
পাওনি আগে যা

হাসির ফোয়ারা

মনের সুখে স্বাদ মেটাবে
পেপসি কিংবা ম্যাজা।

রাগগুলো সব ভ্যানিস হলেও
বাড়ছে প্রেসার-সুগার,
কুছ পরোয়া ভাবটা দেখাও
বয়স ভাবো চার।

ওসব নিয়ে ভাবলে চলে
বয়ঃসন্ধি কালে,
মুখটা যতই পাংশুটে হোক
ফোকলা ওই গালে।

বয়স হারুক মনটা বাড়ুক
জড়তা কাটুক তার,
নিজের মতো বাঁচতে শেখো
সজীব সতেজাকার। ■

অণু সাহিত্য

বর্ণনার বাহুল্যতা ছাড়া মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশই হলো
একপ্রকার অণু সাহিত্য রচনার প্রয়াস...

সবার কাছে আমাদের অনুরোধ অনুগ্রহ করে পুরো পত্রিকাটি ‘শেয়ার’ করুন, এবং লেখক-লেখিকাদের উতসাহিত করুন।

আমরা সমস্ত পাঠকদের মূল্যবান অভিমত জানতে চাই।

দোষ

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

মানুষ জন্মাইলে কোন দোষ নাই, কিন্তু জন্মের পর হইতে দোষের সূত্রপাত – এমনকি মৃত্যু হইলেও রক্ষা নাই। পণ্ডিতগণ বিধান দেন এক পোয়া হইতে চার পোয়া পর্যন্ত দোষ পাইয়াছে। মৃত্যুর পর কি করিয়া বা মরিবার সময় কি করিয়া দোষ হয় তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাও বুঝি না অদ্যাবধি পণ্ডিতগণ পুরানো মাপের হিসাব কেন বজায় রাখিয়াছেন! আগামী দিনেতে নিশ্চয়ই ইহা ঠিক হইয়া যাইবে। সারা জীবন যত দোষ করিয়াছি তাহাতে আমার মৃত্যুর পর পুত্র হয়তো পন্ডিতদের নিকট হইতে শুনিবে – তোমার পিতৃদেবের পুরা এক লিটার দোষ পাইয়াছি।

শুনিয়াছি নরকে নাকি এত বিশাল লাইন পড়িয়াছে যে সেই লাইন ভূমি ফুঁড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং মর্তলোকে দৃশ্যমান হইতেছে। প্রতি সন্ধ্যায় মদের দোকানের সম্মুখে যে বিশাল লাইন দৃশ্যমান হয়, তাহা ওই লাইনের পুচ্ছ কিনা তাহা অবশ্য জানা হয় নাই। আমার অবশ্য কোন চিন্তা নাই, বাল্যকাল হইতেই এত দোষ করিয়াছি যে যমালয়ে আমার আসনখানি সংরক্ষিত রহিয়াছে, লাইনে দাঁড়াইতে হইবে না। আমা হইতে মাত্রই এক বছরের বড় ভগিনীর পিছনে লাগিয়া

দোষের সূত্রপাত, পরবর্তীতে এমন হইয়াছিল যে জ্যেষ্ঠ দোষ করিলে মা তাহার কঞ্চির বারি হইতে কণিষ্ঠকে বঞ্চিত করিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না।

একবারের কথা খুব মনে পরে, আমি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছি, আমার তখনও মাতা-পিতা কিংবা শিক্ষক মহাশয়দিগের চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিবার সাহস হয় নাই। শ্রেণিতে একটি নুতন ছাত্রী আসিয়াছে, গরুর মত সুন্দর চোখ, হরিণ দেখি নাই নচেৎ বলিতাম কালো হরিণ চোখ, দুধে আলতা গায়ের রং। কোনদিনই সে আমার সহিত কথা কহিত না, আর কেনইবা কহিবে পড়াশোনায় সে ছিল বেশ ভালো, সে প্রথম বেঞ্চিতে বসিয়া সমস্ত পড়া মাথা দিয়া অনুভব করিত, আমিও অনুভব করিতাম তবে পিছনের বেঞ্চিতে মাথা ঠেকাইয়া চক্ষু মুদিয়া। তাহার যেমন দুধে আলতা গায়ের রং আমার তেমনই দুধে আলকাতরা।

একদিন শ্রেণীকক্ষে তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই চোখ মারিয়াছিলাম। তখন মোবাইল নামক বস্তুটির জন্মই হয় নাই, টেলিফোন নামক বস্তুটির কথা শুনিয়াছি কিন্তু চাক্ষুষ করি নাই। এমনকি বিদ্যুতও আমাদের কাছে দিবা স্বপ্ন। বিদ্যালয় হইতে খেলিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার আগেই মাতার কর্ণে ঘটনাটি কি করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল তাহা অদ্যাবধি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। যাহা হইয়াছিল তাহা ভাবিলে এখনো শরীর কেমন যেন শুষ্ক নারিকেলের মতো

হইয়া ওঠে। মা কঞ্চির বারি হইতে শুধু বঞ্চিতই করেন নাই, সেই এক কঞ্চি হইতে সর্বাঙ্গে হাজার কঞ্চির ছাপ তুলিয়া আমাকে মুক্তি দিলেন। লজ্জায় দুই'দিন বিদ্যালয় যাইতে পারি নাই। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে নিজেকে কালোর ওপর লাল ডোরা কাটা মৃত ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতো। বোধকরি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও আমার দশা হইয়াছিল, তাই হয়তো তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।" আমার দোষের কথা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। তাহা অন্য একদিন শুনাইব।

আমার প্রতিবেশীর কন্যা বরেণ্যা, সে তাহার কিছু জানিতে হইলেই সোজা আমার কাছে চলিয়া আসে, তাহার পিতা-মাতা হইতে সে আমাকে বেশি ভরসা করে। সে আমার কাছে আসিলে আমার কেমন যেন বাচিক দোষ পাইয়া বসে। আহা! ঘাবড়াইতেছেন কেন? কম বেশি এই দোষে তো সবাই দুষ্ট। ইহা হইল কাহাকেও দেখিলে মুখ হইতে বাক্যটি নিঃসৃত না হইয়া মনের অন্তরে বোমার মতো তোলপাড় করিতে থাকে। উহা ফাটাইতে চাহিলেও ফাটে না, ড্যাম্প বোমা। কি মুস্কিল ইহাও উদাহরণসহ বুঝাইতে হইবে? বুঝি না মাষ্টারি করিতে বসিয়াছি কিনা! যাহা হউক, কাহাকে দেখিলে মনে মনে যখন উচ্চারিত হয়, কি জ্বালা! আবার আসিয়াছে? আপদ! আর পারি না ইত্যাদি। সে আসিয়া এমন সব প্রশ্ন করে যাহা গুগুল মাষ্টারেরও জানা নাই।

বিভ্রান্ত

এই যেমন আজ বিদ্যালয় হইতে সোজা আমার কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল "আলুর দোষ কি?" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন আলু? জ্যোতি না চন্দ্রমুখী? রেডিওতে কৃষিক্ষেত্রের আসরে শুনিয়াছি আলুতে ধসা রোগ হয়।" রেডিওতে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলাম। সে বলিল "না তাহা নহে," বলিল "সে একটি বালকের দিকে তাকাইয়া চোখে চোখে কথা বলিতেছিল তখন তাহার সহপাঠিনী তাহাকে বলিয়াছে, ইহাতে আলুর দোষ হয়।" ধরণী দ্বিধা হও, এমন প্রশ্ন কস্মিনকালেও শুনি নাই। মনে মনে ভাবিলাম কিশোর বয়সে যাহা করিয়াছিলাম তবে তাহা কি আলুর দোষই ছিল?

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া সে পঞ্চম শ্রেণীতে নূতন স্কুলে গিয়াছে। বিভিন্ন স্কুল হইতে ছাত্রছাত্রী আসিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম না কলিকাতার কোন বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণিতে "আলুর দোষ" পাঠ্য ছিল! গুগুল স্যার উত্তর দিতে পারেন নাই। সুধি পাঠক মণ্ডলী যদি একটু বুঝিয়াই দেন যে আলুর দোষ কয় প্রকার ও কি কি এবং কি প্রকারে হয় ও ইহা দোষের নাকি নির্দোষের তবে যমরাজকে গিয়া বলিতে পারিব। অন্তত একটি দোষ খণ্ডন করিয়া শাস্তি কিছুটা লাঘব হইবে। ■

মানস-পট

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

(১)

অজ্ঞাত

কেন মন
বারে বারে
ছুঁতে চায়
অজানারে?
দুটি চোখ
ক্ষণে ক্ষণে
কারে খোঁজে
আনমনে!!! ■

(২)

অব্যক্ত প্রেম

আলত আঙুল ছুঁইয়ে
দিলাম তোমার ঠোঁটের
কোণে,
ক্ষণিক খুশীর স্মৃতিটাকে
আগলে রেখো
মনে... ■

(৩)

বাহুল্যতা

বিচিত্র মানব
মাপতে চায়
ব্রহ্মাণ্ডের পরিসর...
কিন্তু আপন মনের
প্রসারতা খোঁজার
আজও তার হলনা
ক্ষণিকের অবসর...■

(৪)

আমার বাংলা

বাংলার চায়ে চুমুক দিয়েই
আজো আমার ভোরটা
আসে।
বাংলার ঘাসে পায়চারি
করেই আমার সকাল
হাসে...■

(৫)

বাংলা ভাষা

মাঝে মাঝে মনে হয় –
আমাদের শব্দগুলো বুড়ো
হয়ে যাচ্ছে...
তাই বিদেশি শব্দভাণ্ডার
থেকে তরতাজা শব্দের
আমদানি বাড়ছে।। ■

(৬)

মেকী

যে ব্যথা হৃদয়ে বাজেনা,
তার কথা বলা সাজেনা...■

(৭)

অহমিকা

হার-জিতের অহেতুক
ভাবনায় বয়ে যায় সব
বেলা...
এমনি করেই শেষ হয়
কত অমূল্য জীবনের
খেলা! ■

(৮)

পুতুল-জীবন

সময় কখনও নিঠুর করে
আবার কখনও দরদী।
আজ যা তুলে রাখতে মন
চায় কাল তাই ফেলেদি...■

(৯)

আঁতলাম

লক ডাউনে করোনা
ভাইরাসগুলো সত্যি সত্যি
কতটা বিপর্যস্ত জানিনা,
তবে দেশের কোনো ঘরে
যে একজনও দার্শনিক
তৈরি হননি, তা মানিনা... ■

(১০)

আক্ষেপ

সময় যতই এগিয়ে যায়,
না দেখার সম্ভার বাড়ে।
অজানার বিস্তৃতির কাছে
জানা বারে বারে হারে।। ■

হাঁসের ডিম

শামসুদ্দীন শিশির (বাংলাদেশ)

সৈকতদের বাড়ির কাছেই একটা নীচু জমি আছে। সেখানে সৈকতরা ঘাসের চাষ করে। পাশে ডোবার মতো একটা জায়গা। বাড়ির সব হাঁসগুলোই সেখানে জলকেলিতে মেতে ওঠে। একদিন সৈকত ঘাস চাষের জমির পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে দেখে – ঘন ঘাসের ভেতর কয়েকটি হাঁস বসে আছে। কিছুক্ষণ পর ঐ পথ দিয়ে ফিরে আসতে গিয়ে সে দেখে যে ঘন ঘাসের ভেতর হাঁসগুলো নেই। কিন্তু সৈকত অবাক হয়ে দেখলো হাঁসগুলো যে জায়গায় বসে ছিলো, সেই জায়গায় কয়েকটি ডিম পড়ে আছে।

তার বুঝতে অসুবিধা হলনা যে ডিমগুলো হাঁসের। মনের আনন্দে সে ডিমগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দাদীর হাতে দিল। দাদী খুশি হয়ে দেখতে এলেন কোথায় ডিমগুলো সে পেল এবং হাঁসগুলো কাদের। হাঁস দেখে দাদী বললেন, ‘এগুলো তো আমাদেরই! কিন্তু রাতে হাঁসে খোঁয়াড়ে ডিম না দিয়ে এখানে দিচ্ছে কেন? ভাবনায় পড়লেন দাদী।’

এভাবেই অনেক দিন সৈকত মনের আনন্দে ডিম সংগ্রহ করছে আর দাদীকে দিচ্ছে। দাদীও অনেকদিন ভেবে-চিন্তে কারণটা এতদিনে বুঝে ফেলেছেন। তাই দেরি করে

হাঁসগুলো খোঁয়াড় থেকে ছাড়তে লাগলেন। তাই হাঁসগুলো এখন খোঁয়াড়েই ডিম দেয়। এখন আর ঘন ঘাসে ডিম পায় না সৈকত। ভীষণ মন খারাপ তার।

দাদীর কাছে ছুটে গিয়ে সে কারণ জানতে চায়। দাদী সৈকতকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। খুব ভোরে হাঁসগুলো ছেড়ে দিলে ঘন ঘাসের ভেতর গিয়ে তারা ডিম দেয়। কিন্তু দেরি করে খোঁয়াড় থেকে ছাড়লে, তারা খোঁয়াড়েই ডিম দেয়। সৈকত দাদীর যুক্তি শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, এবং হাঁস ডিম না দেওয়ার কারণ বুঝতে পারলো। ■

পাঠকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য

‘গুঞ্জন’ সব থেকে সহজে পড়ার জন্য যে কোন ট্যাব বা ল্যাপটপ ব্যবহার করুন। যাঁরা মোবাইলে পড়ছেন, কম করে ৬ - ১০ এম. বি. জায়গা খালি রাখুন, আর স্ক্রীন ব্রাইটনেসটি ঠিক করে অ্যাডজাস্ট করে নিন। আমরা যতটা সম্ভব বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টে চেক করেই প্রত্যেকটি ইস্যু ছাড়ি, তাই পাঠকদের কোন অসুবিধা না হওয়ারই কথা।

কাল

সামিমা খাতুন

খেয়াল-খুশির গতানুগতিক খেয়ায়
ভাসিয়ে নিয়ে চলে সময়,
দিন আসে, রাত যায়,
নিয়ম মেনে সবই পাল্টায়,
সে আসে আজ - এর আগে-পিছে,
গত-আগামীর হিসাব খোঁজা মিছে।
যার অমোঘ অটুট টানে,
পাপের শাস্তি আঘাত হানে,
বদলায় ক্ষণ, চঞ্চল মন,
নতুন আশায় ভাসায় নব-তপন। ■

নতুন বছর নতুন স্বপ্ন বোনে।
'গুঞ্জন' ই-ম্যাগাজিনের জানুয়ারী সংখ্যা হল
"আশা সংখ্যা"
আপনার স্বরচিত লেখা আমাদের দপ্তরে সত্বর
পাঠিয়ে দিন। আমাদের ই-মেল ঠিকানাঃ
contactpandulipi@gmail.com

প্রতিশোধ

রাখী ভৌমিক

সাতপুরুষের ভিটেটাকে প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে একটুও বুক কাঁপেনি চৌধুরী ভিলার উত্তরাধিকারীদের। অথচ সকলে মিলে চাইলেই রাখতে পারতো বাড়ি, বাগান, ফলন্ত গাছগুলো...

ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভেঙে গেল চৌধুরী ভিলার বড়ছেলে রাজেনবাবুর। কি ভয়ানক স্বপ্ন! তাঁদের বাগানটা রক্তের রঙে লাল হয়ে গেছে – আর তার মধ্যে সারি সারি ন্যাড়া গাছ... যার মাঝে একটা গাছ কঙ্কালের রূপ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে, অট্টহাস্যে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। রাজেনবাবুর পা দুটো মাটিতে আঁটকে গেছে, কিছুতেই তিনি পালাতে পারছেন না।

রাজেনবাবু ছাদে গেলেন, কিছুক্ষণ পায়চারি করে স্বপ্নটা ঝেড়ে ফেলে নীচে নামতে যেতেই টের পেলেন – পা দু'টো ছাদের মেঝেয় গেঁথে গেছে। টবের গোলাপ গাছটা আস্তে আস্তে স্বপ্নে গাছ-কঙ্কালের রূপ নিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে... ■

সাথে থেকো

সন্দীপ বাগ

শহরের কোলাহল স্পর্শ করে না তোমাকে
এখানেই তুমি খুঁজে ফেরো পাহাড়ের নিস্তব্ধতা
সদ্য বৃষ্টি ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধে মাতাল হয়ে
চেয়ে দেখো বৃষ্টি ফোঁটার তৃষিত মাটির আলিঙ্গনকে,
ঠিক সন্ধ্যার মুখে ময়দান ছুঁয়ে থাকা দূরপাল্লার বাস
তোমাকে হাতছানি দেয়, আষ্টেপিষ্টে সংসারী
তুমি ফাঁকা গ্যালারির দিকে উদাস হয়ে তাকাও।

ছুটির শান্ত দুপুরে ট্রাম মিউজিয়াম দেখে
ধর্মতলা থেকে ময়দানের সবুজ বুক চিরে
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, ভিক্টোরিয়া রেসকোর্স
পেরিয়ে খিদিরপুর,
ক্ষণিকের এই ট্রাম যাত্রাপথ শরীর মন জুড়িয়ে দেয়।

কখনো নির্জন প্রিন্সেপ ঘাটে নদীর ছলাৎ ছল ঢেউ
গুনতে গুনতে মনে হয়,
পৃথিবীর সব কাজ বুঝি থেমে আছে এখানে,
ইডেন গার্ডেনের বার্মিস প্যাগোডার নীচে
বোটের প্যাডেলে জলের কলকল শব্দ
নীরবতা খান খান করে

স্বপ্নবিলাসী

দিনটা শেষের দিকে যাবার আগে
ব্যান্ড স্ট্যান্ডে চুপ করে বসে হুমায়ুন আহমেদের
হিমুকে খুঁজে পেলে মনে হয়
জীবনের সব সাধ বুঝি পূর্ণ হল আজ। ■

পূর্ণচন্দ্র

রিয়া মিত্র

গড়িয়ে নামছে জ্যোৎস্নাধারা
ছড়িয়ে দিচ্ছে মুক্তো,
মায়াবী রাতের চন্দ্রিমাতে
নিবিষ্ট মন সিক্ত।
শুভ্র সফেন প্রেমের জোয়ারে
হৃদয় যায় যে ভেসে,
পূর্ণচন্দ্র রাতচরা হয়
যুগে যুগে ভালোবেসে। ■

পাঠকদের সুবিধার জন্য

যাঁরা ‘অনলাইন’-এ ‘গুঞ্জন’ পড়ছেন, কোন নির্দিষ্ট পাতা খুলতে হলে, নীচের ‘মেনু’-র মাঝামাঝি অংশে যে ‘বক্স’-টা রয়েছে, তাতে ‘পেজ নাম্বার’ লিখে ‘এন্টার’ করুন। আপনার পছন্দের ‘পেজ’-টি খুলে যাবে।

লছমি

অমিতাভ রায়

সন্ধ্যা বলে, "লছমি যেমন তোমার বেটি, তেমন ঐ দলিত ঘরের ফুলুও তো কারো বেটি?" নাথু পাত্তা দেয় না। ওর কি এসে যায়? ও গরীব হলে কি হবে উচ্চবর্ণের। ওর কিছুই এসে যায় না ঐ মেয়েটার ব্যাপারে। আসলে আজ সকালে ক্ষেত থেকে সবজি তুলতে গিয়ে নাথু একটা ঘটনা দেখে ফেলেছে।

দেখেছে, পঞ্চায়েতের মাথা যে ব্রিজভূষণ, তার ছেলে রাকেশ আর তার সঙ্গীসাথীরা একটা মেয়েকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওদিকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে নাথু। পুলিশ এসে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ে নাথু বলেছে ও কিছুই জানে না। কেন না সে সময় ওখানেই দাঁড়িয়েছিল ধর্ষণকারীরা। তাছাড়া খামোখা বলবেই বা কেন? পুলিশ অবশ্য তাতে খুশিই হয়েছে। কেউই কিছু দেখেনি। ফুলু মরার আগে নাকি কয়েকটা নাম বলে গেছে। এতেই মুশকিল!

সন্ধ্যা আরো বলে, "তোমার বেটিকে কেউ কিছু করলে?" কি কুক্ষণে সন্ধ্যাকে ও বলে ফেলেছিল ঘটনাটা। নাথু কিছু না বলায় খুশি হয়েছে রাকেশের বাবা। ওকে একটা প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেবে বলেছে। বেটির বিয়ের আর

অসুবিধে হবে না। কেস দাঁড়ায়নি। বিচারে কেউই শাস্তি পায়নি। ফুলুর বাপ-মা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। এমনকি পুলিশই ডেডবডি পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছুদিন বাদেই প্রকল্পের টাকা পেয়ে যায় নাথু। সব টাকা নয়। রাকেশের বাবা বিভিন্ন জায়গায় টাকা খাইয়ে কেস চেপে দিতে পেরেছে, তার জন্য কিছু টাকা নিয়ে নিয়েছে। তবে, যা পেয়েছে তাই বা কম কি? বলে দিলে, নাথু কি পেত? লবডঙ্কা! বরং, নাথুকে হয়তো খুন করেই ফেলতো ওরা।

টাকা নিয়ে ফেরার পথে মনখুশ নাথুর। বাড়ির সামনের ঝোপঝাড়ে ভরা রাস্তাটা দিয়ে সাবধানে আসছিল নাথু। পকেটের টাকা ছুঁয়ে অনুভব করছে ও। আর ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে হাসি ফুটে উঠছে নাথুর।

বিশাল বটগাছের নীচে কিছু যেন হচ্ছে! ঝোপটা নড়ছে। নাথুকে কারা যেন ঘিরে ফেলল। তাদের ফাঁক দিয়ে নাথু দেখে লছমির উপরে রাকেশ। লছমি কাতরাচ্ছে, কাঁদছে। লছমির মুখটা ফুলুর মতো লাগছে। নাথু চেঁচিয়ে উঠতেই সবাই বিচ্ছিরিভাবে হাসতে লাগল। নাথু চোখ বন্ধ করে ফেলে। ধর্ষিতা ফুলুর লাশ ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে নাথু দেখে ওরা চলে গেছে। নাথু এগিয়ে গিয়ে দেখে লছমি যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ওর দিকে ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে আছে। লছমির মুখটা এখন অবিকল ফুলুর মতো লাগছে। ■

সুন্দরের মায়া আছে

অলক চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরের মায়া আছে,
তারই জন্য মন থেমে যায়,
নইলে সে যেত হয়তো দিগন্তের দিকে,
দিগন্তের ব্যাপ্তি তাকে দিত, অন্য কোন মায়া,
সে মায়া এ মায়া নয়,
তাকে স্পর্শ করেনি কখনও অন্ধকার,
তার যাত্রা শুরু আছে,
কিন্তু নেই কোন অন্ত। ■

নাছোড় বর্তমান

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

অর্থহীন দখলে দণ্ডিত অপেক্ষারা
আঁধারের কাছে ছুটি চায়
অর্জিত ক্ষোভেরা একা হলে
ক্লান্তির কাছে নত হয়ে যায়
শালিখের ঠোঁটে শিশিরেরা এখন শোকে মুহ্যমান
রহস্যের আড়ালে ঋজু বেদনার ত্রাস তখনও বর্তমান। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

প্রতীক্ষা

অনির্বাণ বিশ্বাস

"দাও তো চা-টা দিয়ে আসি।" — এই বলে ভোলা বউয়ের হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা নিয়ে নিল।

"দেখো, আবার গল্পে মেতে যেও না। রাত হয়ে গেছে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে কিন্তু..." বউ বলল। ভোলা মাথা নেড়ে চা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের চেয়ারে বসে থাকা একজন বৃদ্ধকে দিয়ে বললে, "এই নিন চা। আজকে কিন্তু আর বেশি দেরি করবেন না। একে শীতকাল তাও শেষ ট্রেন তো চলে গেছে। লোকজনও তো আর কেউ নেই। চা-টা খেয়ে এবার ঘরে চলুন বাবু।"

"ঘর!!!"--কথাটা বলে বৃদ্ধ একটু উদাসী হাসি হাসলেন।"

"সে তো যেতেই হবে বাবু। এতো রাতে ইষ্টিশন চত্বর মোটেও ভালো না বাবু।" তারপর একটু কাছে গিয়ে আস্তে করে বলল, "এখানে অনেক কিছু হয় বাবু। আমি সব জানি, তাই বলছি বাবু। আপনি সাধাসিধা মানুষ..."

চায়ের গ্লাসটা দিয়ে তিনি উঠে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আমার আবার...নতুন করে কি হবে রে পাগলা।" এই বলে একটু হেসে মাথা নেড়ে যাবার ঈশারা করে হেঁটে

যেতে লাগলেন। তারপর আবার পিছনে ফিরে এসে তার হাতে টাকাটা দিয়ে বললেন, “একদম ভুলে গেছিলাম রে।”

ভোলা লজ্জিত হয়ে বলল, “কাল দিলেই তো হতো। আর একদিন না হয় আমি খাওয়ালুম।”

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু হেসে বললো, “না রে, বলা তো যায় না আর যদি না ফিরি।” এই বলে তিনি দ্রুত হেঁটে অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেলেন। ভোলা সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

“কি গো, ঐদিকে এত কি দেখছ? বাড়ি যাতি হবিনি নাকি!”

বউ মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, “আর ঐ বুড়োর লগে এতো আদিখ্যেতা কি বলো দেখি তোমার? আর ও রোজ বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত এখানে বসে থাকে ক্যান? কাজকম্ম কিছু নাই নাকি?”

ভোলা বউয়ের হাতের জিনিসটা নিয়ে বলল, “উনি রোজ অপেক্ষা করেন গো...”

বউ অবাক হয়ে বলল, “অপেক্ষা? রোজ রোজ এতক্ষণ ধরে কার জন্য অপেক্ষা করে? অন্য রকম নেশাটেশা আছে নাকি?”

ভোলা তার বউকে জড়িয়ে ধরে বলল, “আরে না না, ছি ছি! ওনার বউ একসময় বিকেলে ফিরবে বলে গেছিল। কিন্তু আর কোনোদিন ফেরেনি।”

বউ অবাক চোখে জিজ্ঞাসা করল, “ফেরেনি ক্যান?”

ভোলা উদাসভাবে বলল, “কত লোক কত কথা বলে! এত্তো বড়ো শহর। কত শত লোক। হয়তো কারো সাথে ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেছে। কে জানে?”

বউ মুখে হাত দিয়ে অবাক হয়ে বলল, “ও মা! সে কি গা!!! তাও উনি তার জন্য রোজ অপেক্ষা করে থাকেন?”

ভোলা মাথা নেড়ে বউকে জড়িয়ে ধরে। বউও স্বামীর উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করে। শীতের কুয়াশা মাখা অন্ধকারে তারা ধীরেধীরে মিলিয়ে যায়। শিশিরে ভেজা প্ল্যাটফর্মের সেই ফাঁকা বেঞ্চে আবার এসে বসে সেই বৃদ্ধ। অনন্ত প্রতীক্ষার তরে... ■

Photo by Lena Khrupina from Pexels

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ জীবন-চক্রের নক্সা...

শিল্পীঃ রূপসা পাল ✧ বয়সঃ ১৬ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

ঘাস হলে ক্ষতি কি?

সমীর দাস

সবাই তো পারে না হতে, নদী-অরণ্য-পর্বত বা সাগর
কি ক্ষতি তাতে? হতে পার ঘাস, কোমল মখমলের চাদর
গরু-ছাগলে মোড়াবে, খাবে, অবহেলে পায়ে দলিয়ে যাবে
আনন্দে শিশুরা খেলবে, লাফাবে, আরামে শুয়ে ঘুমাবে
এখানে তুমি তুচ্ছ-নগণ্য, অবহেলায়...
অথচ, শহরে ধনীর প্রাসাদে মহার্ঘ্য পণ্য, সবাই তোমাকে চায়।

যেখানেই থাক, যত্নে বা অবহেলায়
নির্বাক, তোমার বিনীত নম্রতার তুলন কোথায়?

ক্ষতের প্রলেপ, দীন- বৈষ্ণব
তোমার বৈভব, সহজে হয় না অনুভব
কেও যদি ঘাস হয়, ক্ষতি কি তাতে?
দুর্বলতা মোটেই নয়, নিরভিমান দীনতায়
বিনা অনুযোগে, অভিযোগে, বিনীত নম্রত্বে। ■
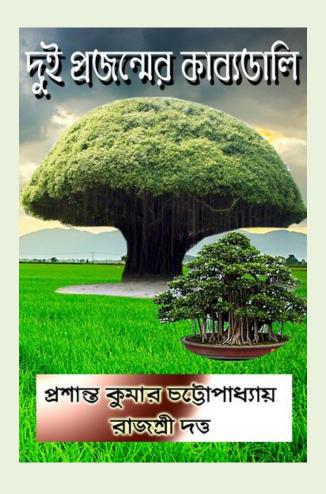
দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

হক-কথা

অমিত কুমার সাহা

আজ বেশ কয়েকমাস বাড়িতে বসা। যেদিন ট্রেনের চাকা থামলো, সেদিন এতটা বুঝতে পারিনি। ভালো লাগছিলো প্রথম প্রথম দু'একদিন। বিশ্রাম কে না চায়! তারপর যতদিন এগোলো সময়ের কালো ছায়া যেন আরো অনেক বেশি করে গ্রাস করতে শুরু করলো আমাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোকে। কাজ নেই, এ কামরা থেকে সে কামরা ছোটাছুটি নেই, হাঁকাহাঁকি নেই, বাবুদের গায়ে কোনো কারণে ধাক্কা লেগে গেলে বাবুদের চোখরাঙানি নেই, সব এক ঝটকায় উধাও। জমানো টুকটাক যা ছিল, তাই দিয়ে চলল কদিন। কিন্তু তারপর? আমার একার পেট তো নয়! বৌ, ছেলেমেয়ে, বয়স্ক মা-বাবা। এখন কয়েকমাস ধরে রেশনের চালটুকুই ভরসা! কিন্তু সেও আর কতদিন!

আঙ্গুল আপনারা আমার দিকে তুলতেই পারেন! একজন সামান্য হকার হয়ে এত্তো কথা! বলতেই পারেন, এতোই যখন বোঝো, তাহলে পড়াশোনাটা ঠিকঠাক করলে না কেন? তাহলে তো আর এই দিন দেখতে হতো না! এবার বাবুরা, সত্যি সত্যিই আপনারা আমায় হাসালেন। আপনাদের অনেকেরই এখনও ধারণা, হকার মানেই অশিক্ষিত। তা নয় গো বাবুরা! পড়াশোনা আমিও করেছি, বাংলায় এম. এ.। কিন্তু ঐ যে, শিক্ষিত বেকার যুবকদের

বাস্তব

রোজগারের তিনটি রাস্তা: টিউশন, ক্যাডার আর নয় হকার।

প্রথম রাস্তায় কয়েকটি মাস হেঁটেছিলাম, কিন্তু যা রোজগার হচ্ছিল সংসার চালানো, নিজের চাকরির জন্য দামি দামি ফর্ম ফিল-আপ এসব নিয়ে আর পেরে উঠছিলাম না সামলাতে। ক্যাডার কোনোদিন হতে চাইনি, আর চাইবোও না। অগত্যা পড়ে থাকলো হকারি, আপাত শেষ সম্বল!

প্রথম প্রথম এই হকারি করেও বেশ কয়েকটি পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ করেছি, কাজ থেকে ফিরে রাত জেগে পড়াশোনা করেছি, পরীক্ষাও দিয়েছি। কিন্তু ঐ, পোড়া কপাল! ইন্টারভিউ ভালো দিয়েও চাকরি পাইনি! কটা পয়সা জমিয়েছিলাম, বি. এড. করবো বলে। এক বোনের, ভালো সম্বন্ধ আসলো, যা জমানো ছিল সব দিয়ে উপরন্তু আরও বেশ কিছু টাকা ধার করে বিয়ে দিলাম বোনের। তারপর বাবা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী, বয়স্কা মা; আমার সব স্বপ্নের ইতি! এর মধ্যে মা বিয়ে দিয়ে দিল আমার। আরো আঁকড়ে ধরলো সংসারের জাঁতাকল, আর আমি হকারি!

এভাবেই চলছিল সব টেনেটুনে। কিন্তু এখন তাও থেমেছে। দিন দুয়েক হলো শহরের রাস্তায় হকারি শুরু করেছি, কিন্তু বিক্রি নেই! মুখে মাস্ক পড়ে হকারি করলে সে ডাক কি খরিদ্দারের কান অব্দি পৌঁছায়? কিন্তু তাও উপায় নেই!

এদিকে পুজো চলে এলো। এবার আর ছেলেমেয়ে দুটোকেও নতুন জামা কিনে দিতে পারবো না! ভাবছি, কাজের অছিলায় পুজোর ক'টা দিন বাড়ি ছাড়া থাকবো, হাজার হোক ওদের ঐ করুণ মুখগুলো তো আর চোখের সামনে দেখতে হবে না! ■

আনন্দি

সাধনা চক্রবর্তী (আমেরিকা)

কাজের মাসী মানদা ফাই ফরমায়েশ খাটতে আনন্দিকে নিয়ে একদিন এ বাড়িতে এলো। মেয়েটার হাড় জিরজিরে শরীর দেখে তো সুপ্রিয়া দেবী অবাক হলেন! মাথায় তেলবিহীন রুক্ষ চুলগুলো পার্লারে না গিয়েই যেন ডাই করা! ডাক্তার নিখিলেশের স্ত্রী সুপ্রিয়া গৃহবধূ হলেও সব সময় ক্লাব ও সভা-সমিতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সুপ্রিয়া দেবীর কাছে আনন্দি যেন এক জ্যান্ত রিমোট। ডাকলেই রেসপন্স।

এ বাড়িতে আনন্দির দু'বছর হতে চলল। নিয়মিত খেয়ে-দেয়ে অভাবি সংসারের মেয়েটার রূপ লাবণ্য ঝরে পড়ছে। আন্টির কাছ থেকে আনন্দি অনেক কাজও রপ্ত করে নিয়েছে। আনন্দিকে সুপ্রিয়া ভালোই বাসেন, তবে মাথা চড়ে গেলে দুয়েক ঘা বসাতেও দ্বিধা করেননা। আনন্দি আড়ালে চোখের জল ফেলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। বাপ-মা হারা মেয়ে! বড়লোকের বাড়ীতে কাজ পেয়েছে। তা-ই তো ওর ভাগ্য। আজ অনেক রাত জেগে সুপ্রিয়া লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। নিখিলেশ চেম্বার থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে ডাকলেন, "এসো সুপ্রিয়া ডিনার করি। কি এমন লিখছো মাথা গুঁজে?"

সুপ্রিয়া বললেন, "আগামীকাল সন্ধ্যায় দুঃস্থ শিশু স্কুলের

বঞ্চিত

বার্ষিক সভায় আমি প্রধান অতিথি হিসেবে থাকছি। তাই বক্তব্যটা লিখে কয়েকবার পড়তে হচ্ছে। জনসভায় বক্তব্য রাখা কি যে সে কথা?

নিখিলেশ হেসে বললেন, "তা....বটে! কিন্তু তুমি তো আজ ধনীর ক্লাবে, কাল দুঃস্থ মিটিংয়ে!"

নিখিলেশের কথা শুনে সুপ্রিয়া রেগে বললেন, "ওসব তুমি বুঝবে না। আমি পরে ডিনার করবো।"

পরদিন সন্ধ্যা। সুপ্রিয়া জনসভায় যেতে তৈরি হচ্ছেন। হঠাৎ ভাবলেন এই মঞ্চে যদি কৌশলে আনন্দিকে উঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে একটা চমক সৃষ্টি হয়ে যাবে! সুপ্রিয়া আনন্দিকে ডেকে বললেন, "আনন্দি, তুই আজ আমার সাথে যাচ্ছিস।"

আনন্দি অবাক হয়ে বলে, "আমি! আপনার সাথে?" সুপ্রিয়া বললেন, "হ্যাঁ রে, ভালো জামা-কাপড় পড়ে তৈরি হয়ে যা। আমি যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবো তখন তুই আমার পেছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবি জলের বোতল হাতে নিয়ে। আমি নাম ধরে ডাকলেই এগিয়ে আসবি। পারবি না?"

আনন্দি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। জনসভা শুরু হয়ে গেছে। একে একে অতিথিদের বক্তব্য শেষ হলে সুপ্রিয়া এসে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। মুখস্থ করা পনেরো মিনিটের বক্তব্যে গণ্যমান্য দর্শক শ্রোতাদের উদাত্ত আহ্বান জানালেন, দুঃস্থ শিশু স্কুলের ফান্ডে টাকা ডোনেট করার জন্য। ধনী সুশ্রী গৃহবধূ সুপ্রিয়ার ছবি তোলার জন্য

অনেকেই আগ্রহী। কাল কাগজেও ছবি আসবে তাই সুপ্রিয়া মনে মনে গর্বিত। এবার বক্তব্য শেষ করে সুপ্রিয়া চেয়ারে আসন গ্রহণ করে পিছন ফিরে ডাকলেন, আনন্দি....।

আনন্দি জলের বোতল নিয়ে সুপ্রিয়ার কাছে এসে দাঁড়ালো। সুপ্রিয়া জল খেয়ে আনন্দিকে যেতে বললেন। তখন সুপ্রিয়ার পাশে বসা একজন পুরুষ অতিথি বললেন, "আপনার মেয়েটাতো ভীষণ কেয়ারিং ম্যাডাম!"

সুপ্রিয়া হেসে বললেন, "আনন্দি কাজের মেয়ে হয়েই আমার বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু ওইটুকু মেয়েকে দিয়ে কি কাজ করানো যায় বলুন? আমি ওকে নিজের মেয়ের মত রেখেছি। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। ওর সব দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর মঞ্চে বসা অতিথিরা সুপ্রিয়ার মানবতাবোধের প্রশংসা করে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। সর্বহারা মেয়ে আনন্দি নিজের অজান্তেই আন্টির বক্তব্যের এক জীবন্ত উপাদান হয়ে উঠলো।

রাতে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসে আনন্দি অবাক হয়ে আলো ঝলমলে শহর দেখছে। "চোখের আলোয় চোখের বাহিরে" দেখে আনন্দি আজ ধন্য হচ্ছে! সুপ্রিয়া অনেক গর্ব নিয়ে আজ বাড়ি ফিরছেন। আনন্দি না থাকলে কি নিজের মহানুভবতা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারতেন? নিঃস্ব আনন্দিরা এভাবেই কত ধনীদের প্রয়োজনের উপাদান হয়ে যায় তার হিসেব ক'জন রাখে! ■

PREVENTION OF COVID - 19

SOCIAL DISTANCING
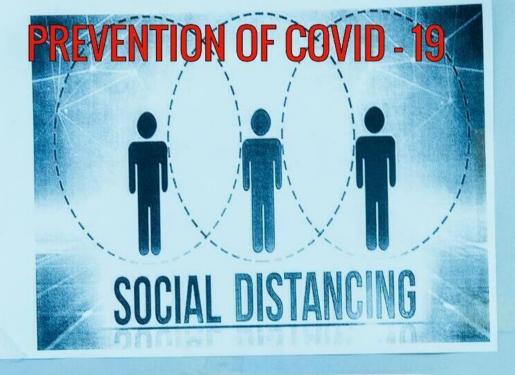
Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels